Contents

ঈমান বিনষ্টকারী আক্বিদা ও মারেফাতের গোপন প্রশ্নের জবাব

আব্দুশ শাফী আহমাদ

ঈমান বিনষ্টকারী আকীদা
ও
মারেফতের গোপন প্রশ্নের জবাব

ওয়াহীদিয়া ইসলামীয়া লাইব্রেরী

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

সংকলনে-

আব্দুশ শাফী আহমাদ

পরিচালক

তাওহীদ পাঠাগার

দারুশা বাজার, পবা, রাজশাহী।

মোবাইল : ০১৭২৭-০৫৭৪৭৭

www.waytojannah.com

ঈমান বিনষ্টকারী আকীদা ও
মারেফতের গোপন প্রশ্নের জবাব

আব্দুশ শাফী আহমাদ

প্রকাশক
তাওহীদ পাঠাগার
দারুশা বাজার, পবা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৯২৭-৫৫৭৪৭৭

প্রথম প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০১১ খ্রিষ্টাব্দ
রবিউল আউয়াল, ১৪৩২ হিজরী.

সর্বসত্ব
লেখক

কম্পিউটার কম্পোজ ও বর্ণবিন্যাস
আবুল আহসান মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ

প্রচ্ছদ
আল-মারুফ সুপারকম রিলেশন
গোরহাঙ্গা, রাজশাহী।

মুদ্রণ
বৈশাখী প্রেস
গোরহাঙ্গা মসজিদের পশ্চিমে, রাজশাহী।

হাদিয়া ঃ ১০০ টাকা।

www.waytojannah.com

প্রারম্ভিক কথা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلٰى مَنْ لاَّنَبِيَّ بَعْدَ-

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ لرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা! আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তার ইবাদত বা হুকুম মান্য করার জন্য। কিন্তু আমরা আল্লাহ সুবহানা তা'আলার হুকুমের সাথে আমাদের হুকুমকে জড়িয়ে ফেলছি। যার কারণে আমর আল্লাহু সুবহানাহু তা'আলার গজবের শিকার হচ্ছি। দিনের দিন ইসলাম বিতর্ক হয়ে পড়ছে। কোনটি আল্লাহর বিধান, আর কোনটি মানুষের মতবাদ তা বুঝা কঠিন হয়ে পড়েছে। তাই আমাদের সবারই উচিত সঠিক কথা বলা। যাতে করে আমাদের মুসলিম ভাইরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমরা দেখেছি যে, মুসলিম ভাইয়ের নিকট যখন ইসলারে দাওয়াত প্রদান করা হয়। তখন তারা বলে আমাদের মাযহাবে এটা জায়েয নাই। যদি বলা হয়, আল্লাহু সুবহানাহু তা'আলা নিরাকার নয়। তিনি সাকার, তবে আমরা বিস্তারিতভাবে অবগত নই।

তখন তারা বলে আমাদের মাযহাবের আকীদা হল আল্লাহ নিরাকার। আর এই নিরাকার বিশ্বাস না করলে, সে কাফির। তাহার কোন ঈমানই থাকবে না। মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন মাটির মানুষ। তিনি নুরের সৃষ্টি নয়। তাঁর ও আমাদের মাঝে পার্থক্য হল ওহী। তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করা হয়েছে। আর আমাদের প্রতি ওহী নাযিল করা হয়নি। কিন্তু ভ্রান্ত মতবাদীরা বলে মুহাম্মদ (সা.) নূরের সৃষ্টি, তিনি আমাদের মত মানুষ নই। আর রাসূল (সা.) গায়েব জানতেন না। তাঁকে জানানো হত। এই আকীদার কথ বললে তারা বলে, আল্লাহর রাসূল (সা.) গায়েব সম্পর্কে জানতেন। এই বিশ্বাস না থাকলে ঈমানই থাকবে না সে কাফির হয়ে যাবে।

এই ভাবে ইসলামের মৌলিক শাখা প্রশাখাগুলিতে ভ্রান্ত আকীদার প্রবেশ ঘটেছে। যা থেকে বেঁচে থাকা অতিব জরুরী। সে লক্ষ্যে এই বইয়ের রচনা। যাতে করে ভ্রান্ত আকীদা জেনে, সঠিক আকীদাগুলি গ্রহণ করতে পারি এবং সঠিকভাবে ইসলাম মান্য করে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারি। আল্লাহু সুবহানাহু তা'আলা আমাদের সে তাওফিক প্রদান করুন। আমীন ॥

বিঃ দ্রঃ সম্মানিত পাঠকবৃন্দ, বই সংকলেন অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এর মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থাকা স্বাভাবিক। ভুল ভ্রান্তি গুলো অবগত করিয়ে দিলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

-আব্দুশ শাফী আহমাদ

www.waytojannah.com

সূচীপত্র

১।	গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি........................	০৫---২০
২।	ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ..........................	২১---২৫
৩।	সুরেশ্বরী..	২৬---৩৬
৪।	এনায়েতপুরী..	৩৭---৪৩
৫।	আটরশী..	৪৪---৫০
৬।	চন্দ্রপুরী..	৫১---৫৪
৭।	দেওয়ানাবাগী..	৫৫---৬৫
৮।	রাজারবাগী..	৬৬---৭৪
৯।	মাইজভাণ্ডারী..	৭৫---৮৪
১০।	বে শরা পীর-ফকীর....................................	৮৫---৯১
১১।	বাউল সম্প্রদায়...	৯২---৯৮
১২।	সর্বেশ্বরবাদ/ সর্বখোদাবাদ..............................	৯৯--১০৩
১৩।	এন, জি, ও...	১০৪-১০৯
১৪।	গান-বাদ্য প্রসঙ্গ...	১১০-১১৯
১৫।	সামা (سماع) প্রসঙ্গ	১২০-১২২
১৬।	ওরশ প্রসঙ্গ	১২৩-১২৮
১৭।	রাজতন্ত্র..	১২৯-২৩১
১৮।	নাৎসীবাদ...	১৩২-১৩৩
১৯।	সাম্রাজ্যবাদ..	১৩৪-১৩৫
২০।	গণতন্ত্র..	১৩৬-১৩৮
২১।	ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ......................................	১৩৯-১৪১
২২।	জাতীয়তাবাদ...	১৪২-১৪৫
২৩।	বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত জাল ও দুর্বল হাদীসসমূহ....	১৪৬-১৪৯
২৪।	শিরক সঙ্গীত...	১৫০-১৬৭

www.waytojannah.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

গীবত ও গীবতকারীর পরিণতি

ইসলাম ঐক্যবদ্ধ থাকার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে। ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টকারী সমুদয় কর্ম হ'তে বিরত থাকতে সকলকে তাগীদ দিয়েছে। সমাজে যেসব বিষয়ে ফাটল ধরাতে এবং ঐক্যের সুরম্য প্রাসাদকে ভেঙ্গে তছনছ করে দিতে সক্ষম এমন বিষয়গুলির অন্যতম হ'ল পরনিন্দা বা 'গীবত'। এর মাধ্যমেই শয়তান সমাজে ফাটল ধরিয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর জন্য দুর্ভোগ'। [সূরা হুমাযাহ, ১] কুরআন ও হাদীছে এই আচরণ সম্পর্কে বিভিন্নভাবে সর্তক করা হয়েছে।

গীবত-এর সংজ্ঞাঃ 'গীবত' অর্থ বিনা প্রয়োজনে কোন ব্যক্তির দোষ অপরের নিকটে উল্লেখ করা। ইবনুল আছীর বলেন, 'গীবত হ'ল কোন মানুষের এমন কিছু বিষয় যা তার অনুপস্থিতিতে উল্লেখ করা, যা সে অপছন্দ করে, যদিও তা তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে'। এসব সংজ্ঞা মুলতঃ হাদীছ হ'তে নেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) গীবতের পরিচয় দিয়ে বলেন, 'গীবত হ'ল তোমার ভাইয়ের এমন আচরণ বর্ণনা করা, যা সে খারাপ জানে'।[১]

গীবত করার পরিণামঃ গীবত কবীরা গুণাহ্র অন্তর্ভূক্ত। গীবতের পাপ সূদ অপেক্ষা বড়; বরং হাদীছে গীবতকে বড় সুদ বলা হয়েছে [সহীহ আত্ তারগীব] রাসুলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে আয়েশা (রাঃ) ছাফিইয়া (রাঃ)-এর সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনার জন্য ছাফিইয়ার এরকম এরকম হওয়াই যথেষ্ট। এর দ্বারা তিনি ছাফিইয়ার বেঁটে সাইজ বুঝাতে চেয়েছিলেন। এতদশ্রবণে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'হে আয়েশা! তুমি এমন কথা বললে, যদি তা সাগরের পানির সঙ্গে মিশানো যেত তবে তার রং তা বদলে দিত'।[২]

---

[১] মুসলিম, হা/১৮০৩

[২] আবুদাউদ, তিরমিযী, হাদীছ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৫১৪০; মিশকাত/৪৮৪৩।

১. গীবত জাহান্নামে শাস্তি ভোগের কারণঃ রাসুলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, 'মি'রাজ কালে আমি এমন কিছু লোকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলাম, যাদের নখগুলি পিতলের তৈরী, তারা তা দিয়ে তাদের মুখমণ্ডল ও বক্ষগুলিকে ছিড়ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এরা কারা হে জিবরিল? তিনি বললেন এরা তারাই যারা মানুষের গোশত খেত এবং তাদের ইযযত-আবরু বিনষ্ট করত'।[৩]

২. গীবত মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার শামিলঃ আল্লাহ বলেন,.

وَلاَ يَغْتَبْ بَّعْضُكُم بَعْضاً اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّأْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوْهُ –

'তোমাদের কেউ যেন কারো গীবত না করে, তোমাদের কেউ কি চায় যে, সে তার মৃত ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ করবে ? তোমরা তো এটাকে ঘৃণাই করে থাকো'। অত্র আয়াত প্রমাণ করে যে, গীবত করা মৃত ব্যক্তির গোশত ভক্ষণ করার শামিল। [সূরা হুজুরাত, ১২]

আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, আরবরা সফরে বের হ'লে একে অপরের খেদমত করত। আবুবকর ও ওমর (রাঃ)-এর সাথে একজন খাদেম ছিল। (একবার সফর অবস্থায়) ঘুম থেকে তারা উভয়ে জাগ্রত হয়ে দেখেন যে, তাদের খাদেম তাদের জন্য খানা প্রস্তুত করেনি, তখন তাঁরা পরস্পরকে বললেন, দেখ এই ব্যক্তিটি বাড়ীর ঘুমের ন্যায় ঘুমাচ্ছে (অর্থাৎ এমনভাবে নিদ্রায় বিভোর যে, মনে হচ্ছে সে বাড়ীতেই রয়েছে, সফরে নয়)। অতঃপর তারা তাকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, রাসুল (ছাঃ) এর কাছে যাও এবং বল আবুবকর ও ওমর আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং আপনার কাছে তরকারী চেয়ে পাঠিয়েছেন (নাস্তা খাওয়ার জন্য)। লোকটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে গেলে তিনি বললেন, তারাতো তরকারী খেয়েছে তখন তারা বিস্মিত হ'লেন এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে এসে বলছেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা আপনার নিকটে এসে লোক পাঠালাম তরকারী তলব করে, অথচ আপনি বলেছেন,

---

[৩] আবুদাউদ, মুসনাদে আহমাদ, হাদীছ ছহীহ।

আমরা তরকারী খেয়েছি ? তখন নবী করীম (ছঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের (খাদেমের) গোশত খেয়েছ। কসম ঐ সত্তার! যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয়ই আমি ঐ খাদেমটির গোশত তোমাদের সামনের দাঁতের ফাঁক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি। তারা বললেন, (হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা তলব করুক)। আলবানী হাদীছটিকে ছহীহ বলেছেন।[৪]

قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ كُنَّا عِنْدَا لنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهَ وَسَلَّمَ فَقَامَ رَجُلٌ أَىْ غَابَ عَنِ الْمَجْلِسِ) فَوَقَعَ فِيْهِ رَجُلٌ مِّنْ بَعْدَهِ فَقَالَ وَمِمَّ أَتَخَلَّلُ وَمَا أَ كَلْتُ لَحْمًا قَالَ إِنَّكَ أَكَلْتَ لَحْمَ أَخِيْكَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, (একদা) আমরা নবী করীম(ছাঃ)-এর নিকটে ছিলাম। এমতাস্থায় একজন ব্যক্তি উঠে চলে গেল। তার প্রস্থানের পর একজন তার সমালোচনা করল। তখন রাসুলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তোমার দাঁত খিলাল কর। লোকটি বলল, কি কারণে দাঁত খিলাল করব ? আমিতো কোন গোশত ভক্ষণ করিনি। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি তোমার ভাইয়ের গোশত ভক্ষন করেছ' অর্থাৎ 'গীবত' করেছ।[৫]

গীবত কবরে শাস্তি ভোগের অন্যতম কারণঃ একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি থমকে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। তবে তাদেরকে তেমন বড় কোন অপরাধে শাস্তি দেওয়া হচ্ছেনা (যা পালন করা তাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল)। এদের একজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে, চুগলখোরী করার কারণে এবং অন্যজনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে পেশাবের ব্যাপারে অসতর্কতার কারণে।[৬] অপর হাদীছে চুগোলখোরীর পরিবর্তে গীবত করার কথা উল্লেখ রয়েছে।[৭]

---

[৪] দ্রঃ আমাসিক আলায়কা লিসানাকা (কুয়েতঃ ১ম সংস্করণ ১৯৯৭ইং),
[৫] ত্বাবারানী, ইবনু আবী শায়বা, হাদীছ ছহীহ দ্রঃ গায়াতুল মারাম হা/৪২৮।
[৬] বুখারী, মুসলিম, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫৭।
[৭] আহমাদ প্রভৃতি, ছহীহ আত-তারগীব হা/১৬০ 'পবিত্রতা' অধ্যায়।

গীবতের প্রতি উদ্বুদ্ধকারী বিষয় সমূহ ঃ

রাগ ও ক্রোধঃ রাগ ও ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অনেকে গীবত করে থাকে। অথচ রাগ দমন করা একটি মহৎ গুণ। আল্লাহ বলেন-

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِىْ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ-

যারা সচ্ছল-অসচ্ছল উভয় অবস্থায় দান করে থাকে, ক্রোধকে সংবরণ করে থাকে এবং মানুষের অপরাধকে মার্জনা করে থাকে, আল্লাহ এই জাতীয় সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন। [আলে ইমরান ঃ ১৩৪]

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'যে ব্যক্তি রাগ দমন করে নিবে অথচ সে তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম, আল্লাহ তাকে সমস্ত সৃষ্টিকুলের সম্মুখে ডেকে 'হুর'দের ব্যাপারে তাকে স্বাধীনতা দিবেন। সে যত সংখ্যক 'হূর' চাইবে আল্লাহ তাকে তাদের সাথে বিয়ে দিয়ে দিবেন।[৮]

নিজেকে বড় মনে করা এবং অপরকে খাটো করা ঃ এই অসৎ উদ্দেশ্যে মানুষ একে অপরের গীবত করে থাকে। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোন ব্যক্তির অমঙ্গলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজ মুসলিম ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। [মুসলিম]

খেলাধূলা ও হাসিঠাট্টা ঃ অর্থাৎ খেল তামাসা ও ঠাট্টা-মশকরা করতে গিয়ে বিনা প্রয়োজনে অনেক সময় মানুষ পরনিন্দায় জড়িয়ে পড়ে। অনেকে এ ই সমালোচনা দ্বারা নিজের জীবিকা নির্বাহেরও ব্যবস্থা করে থাকে। নবী করীম (সা.) এই ধরনের লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন-

وَيْلٌ لِّلَّذِىْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَيْلٌ لَّهُ وَيْلٌ لَّهُ-

দুর্ভোগ ঐ ব্যক্তির জন্য, যে মানুষকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। দুর্ভোগ তার, দুর্ভোগ তার।[৯]

---

[৮] সুনান চতুষ্ঠয়, মুসনাদে আহমাদ, ত্বাবারাণী ছাগীর প্রভৃতির বরাতে ছহীহুল জামে হা/৬৫২২।
[৯] আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, হাকেম প্রভৃতির বরাতে ছহীহুল জামে হা/৭১৩৬।

পরস্পরের কথায় মিল দিয়ে চলাঃ বন্ধু-বান্ধবের সাথে মিল দিয়ে চলা এবং তাদের কথার প্রতিবাদ না করে বাহ্যিকভাবে তা সমর্থন করা। কারণ প্রতিবাদ করলে তাকে তারা ভারী মনে করবে ও খারাপ ভাববে।

এই প্রকৃতির লোকদের নবী (সা.)-এর নিম্নের বাণী স্মরণ রাখা উচিত-

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مَؤُنَةَ النَّاسِ وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَّلَهُ اللهُ اِلَى النَّاسِ-

'যে ব্যক্তি মানুষকে নাখোশ রেখে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করা আল্লাহ তা'আলাই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবেন। মানুষের সাহায্য হতে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মানুষের সন্তুষ্টি কামনা করে আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তাকে মানুষের নিকট সোপর্দ করে দিবেন।'[১০]

হিংসা-বিদ্বেষ ঃ হিংসা-বিদ্বেষের তাড়নায় অনেকে অপরের গীবতে জড়িয়ে পড়ে। এই হিংসা-বিদ্বেষ শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। নবী করীম (সা.) বলেন, ' তোমরা একে অপরের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ কর না। [বুখারী]

নবী করীম (সা.) আরো বলেন-

دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمُ الْبَغْضَاءُ وَالْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ، لَيْسَ حَالِقَةُ الشَّعْرِ، وَلكِنْ حَالِقَةُ الدِّيْنِ-

'তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করেছে তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির রোগ তথা হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা। আর এ ঘৃণাবোধ হ'ল মুণ্ডনকারী বিষয়। এটা চুল মুণ্ডনকারী নয়; বরং দিনকে মুণ্ডনকারী'।[১১]

বেশী বেশী অবসরে থাকা এবং ক্লান্তি অনুভব করা- এধরনের মানুষই অধিকহারে গীবত করে থাকে। কারণ তার কোন কাজ থাকে না। সময় কাটানোর মাধ্যম হিসাবে সে নোংরা পথকে বেছে নেয়। এই প্রকৃতির ব্যক্তিদের

---

[১০] ছহীহুল জামে' হা/৬০৯৭।

[১১] আহমাদ, তিরমীযি, ছহীহুল জামে' হা/৩৩৬১

উচিত অবসর সময়কে আল্লাহর আনুগত্যে, ইবাদতে, ইলম অন্বেষণে এবং দুনিয়া ও আখেরাতের উপকারে আসে এমন কাজে ব্যয় করা। তবেই তারা অন্যের সমালোচনা করার সময় পাবে না। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

نَعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِيْمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفِرَاغُ-

'দুটি নেয়ামত এমন রয়েছে, যার ব্যাপারে অনেক মানুষ ধোকাগ্রস্ত রয়েছে। সুস্থতা ও অবসর।[১২] এজন্যই তিনি অন্য একটি হাদীসে বলেন-

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ-

'পাঁচটি বস্তুকে অপর পাঁচটি বস্তুর পূর্বে মূল্যায়ন করবে, যৌবনকালকে বার্ধক্য আসার পূর্বে, সুস্থতাকে অসুস্থতার পূর্বে, সচ্ছলতাকে অসচ্ছলতার পূর্বে, অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে, জীবনকে মরণের পূর্বে'।[১৩]

আত্মপ্রশংসা করা এবং নিজের দোষ-ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া ঃ এ কারণেও অনেকে গীবতে জড়িয়ে পড়ে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

وَإِمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَشُحٌّ مَطَاعٌ وَهُوَ مُتْبِعٌ وَاِعْجَابُ الْمَرْأُ بِنَفْسِهِ-

'এবং ধ্বংসাত্মক বিষয়গুলি হ'ল, অনুসৃত বখীলী, প্রবৃত্তি এবং আত্মপ্রশংসা।'[১৪]

পরিবেশিত সংবাদ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা ঃ অনেক সময় দেখা যায়, একটা সংবাদের উপর ভিত্তি করে অনেকে অনেক কিছু বলাবলি করে। অথচ পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সংবাদটি সম্পূর্ণ ভূয়া প্রমাণিত হয়। এ প্রসঙ্গে একটি গুজবের কথা উল্লেখ করা যায়, সাহাবী ছা'লাবা নাকি খুব নিঃস্ব ছিলেন। তাই নবী করীম (সা.)-এর সাথে নামায আদায় শেষ হলেই সে দৌড়ে বাড়ি চলে যেতেন নবী করীম (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এমনটি কর কেন? উত্তরে সে বলল,

---

[১২] বুখারী হা/২৯১।
[১৩] হাকেম বায়হাকী, আহমাদ, ছহীহুল জামে' হা/১০৭৭।
[১৪] বাযযার, বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে ' হা/৫০

আমাদের একটি মাত্র কাপড় আছে। তাই আমি যখন নামায আদায় করতে আসি, তখন আমার স্ত্রী উলঙ্গ হয়ে ঘরে অপেক্ষায় থাকে। আমি গিয়ে তাকে আমার পরণের কাপড় খুলে দিলে সে তা পরিধান করে নামায আদায় করে। এজন্যই আমি নামায শেষে দ্রুত বাড়ী চলে যাই। অতঃপর সে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট তার সচ্ছলতার দরখাস্ত করলে নবী করীম (সা.) তার ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন। ফলে অল্প দিনেই সে বিত্তশালী হয়ে যায়। গরু-বকরীর পালে তার বাড়ী-ঘর ভরে যায়। ফলে সে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে আসা ত্যাগ করেন। শুধু যোহর ও আছর জামা'আতে আদায় করতে লাগলেন। গরু-ছাগল বেড়ে গেলে যোহর-আছরেও আসা ত্যাগ করেন। শুধু জুম'আয় শরীক হত। সম্পদ আরো বেড়ে যাওয়ায় জুম'আও পরিত্যাগ করল। নবী করীম (সা.) এক সময় তার কাছে যাকাত আদায় করতে লোক পাঠালে সে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে নবী করীম (সা.) তার জন্য আফসোস করেন এবং তার সম্পর্কে আয়াত নাযিল হয়। পরবর্তীতে সে নিজে নবী করীম (সা.)-এর কাছে যাকাতের সম্পদ নিয়ে আসলে তিনি তা প্রত্যাখান করেন। নবী করীম (সা.) মৃত্যুবরণ করার পর আবুবকর (রা.)-এর যামানায় সে যাকাত নিয়ে তার দরবারে উপস্থিত হলে তিনিও তার যাকাত নিতে অস্বীকৃতি জানান। আবুবকর(রা.)-এর পর ওমর (রা.)- এর যামানায় সে যাকাত জমা দিতে আসলে, ওমর (রা.) ও একইভাবে যাকাত গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানান। ওসমান (রা.)-এর জামানাতে যাকাত নিয়ে গেলে ওসমান (রা.)ও তাই করেন এবং ওসমান (রা.) এর যামানাতেই তার মৃত্যু হয়।[১৫] ঘটনাটি সহীহ নয়।[১৬] উক্ত ঘটনার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। অথচ বানোয়োট কাহিনীর উপর ভিত্তি করেই জলীলুল ক্বদর সাহাবী ছালাবাহ (রা.)-এর গীবত করা হয়েছে।

এরকমই আরেকটি ঘটনাঃ দাঊদ (আ.) নাকি আওরিয়া নামক জনৈক ব্যক্তিকে জিহাদে প্রেরণ করেছিলেন এজন্য যে, তার স্ত্রী খুবই সুন্দরী ছিল। জিহাদে সে শহীদ হলে তার স্ত্রীকে বিবাহ করতে পারবেন এবং বাস্তবে নাকি তাই করেছিলেন। অর্থাৎ তাকে একাধিকবার যুদ্ধে পাঠান, যাতে সে নিহত হয় এবং শেষবার যুদ্ধে নিহত হলে তিনি তার সুন্দরী স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। এ ঘটনাটিও এক বানোয়াট ঘটনা।

---

[১৫] আল কুরআনের গল্প শুনি সামান্য তারতম্যে, পৃঃ ৪৬-৫১।

[১৬] দ্রঃ ক্বাছাছুন লা তাছবুতু ১/৪৩ পৃঃ, ক্বিচ্ছা নং ৩।

বিদ্বেষী মহল দাউদ (আ.)-কে খাটো করে দেখানোর জন্যই উক্ত ঘটনা রচনা করেছে। অথচ উক্ত ঘটনা মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত। পরিবেশিত তথ্য যাচাই না করার কারণে নবীদের নামেও গীবত হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে আরেকটি গীবত বহুল প্রচলিত যে, সাহাবায়ে কেরাম বগলে পুতুল রেখে নামায আদায় করতেন। তাই নবী করীম (সা.) তাদেরকে রাফউল ইয়াদায়েন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেন পুতুলগুলি সব ঝরে পড়ে যায়। একথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। অথচ এই ভিত্তিহীন কথাটি আলেম-জাহেল সকলের মুখে সমানভাবে শোনা যায়। যদি তাই হয়, তবে কেন নবী করীম (সা.) স্বয়ং নিজে রাফ'উল ইয়াদায়েন করেছিলেন? যার জাজ্বল্য প্রমাণ বুখারী ও মুসলিম শরীফের একাধিক হাদীসে রয়েছে। তবে কি নবীও বগলে পুতুল নিয়ে নামাযে হাযির হতেন? (নাউযুবিল্লাহ)। জানি না, সর্বপ্রথম কোন জাহেল এই জঘন্য মন্তব্যটি করেছিল? সাহাবীদের শানে এই ধরণের বেয়াদবী, তাদের নামে এ ধরণের গীবত সত্যিকার অর্থেই অত্যন্ত দুঃখজনক। আল্লাহ আমাদেরকে এ ধরণের বদ আক্বীদা হতে তওবা করার তাওফীক দিন।

'খেলাফত ও মূলক' কিতাবে বর্ণিত ওসমান ও মু'আবিয়া এবং আমর ইবনুল আস (রা.) প্রমুখের বিরুদ্ধে ইতিহাসের বরাতে আনিত অভিযোগগুলির কোন সঠিক ভিত্তি নেই। অথচ এই বইয়ে পরিবেশিত ভিত্তিহীন কথাগুলিকে কেন্দ্র করে বিশেষ একটি মহল সাহাবীদের অহেতুক সমালোচনায় নিয়োজিত। অভিযোগগুলির মূল রেফারেন্স হল ঐ সব ঐতিহাসিক কিতাব, যাদের লেখকগণ স্বয়ং নিজেরাই ঐ ঐতিহাসিক বর্ণনাগুলির সত্যাসত্যের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। কাজেই ইতিহাসের এসব মিথ্যা ও বানোয়াট বর্ণনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাহাবীদের সমালোচনায় লিপ্ত হওয়া নির্বুদ্ধতা, মুর্খতা এবং শী'আ বা রাফেযী মতবাদের পুষ্টি সাধন করে আর কিছুই নয়।

গীবতকারী ও গীবত শ্রবণকারী পাপের দিক থেকে সমান ঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন,

مَنْ رَأَىْ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهُ فَانْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَإِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِه وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ-

'তোমাদের কেউ যদি কোন মুনকার তথা গর্হিত কাজ দেখে, তাহলে সে যেন তা প্রতিহত করে হাত দিয়ে, যদি না পারে তবে যবান দিয়ে, যদি তাও না পারে তবে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করে। আর এটা হল সবচেয়ে দুর্বল ঈমানের পরিচয়।'[১৭] গীবত করা যেহেতু একটি মুনকার কাজ, সেহেতু তারও প্রতিবাদ করা আবশ্যক। যদি কেউ শক্তি থাকতে প্রতিবাদ না করে, তবে সেও গীবতকারী বলে গণ্য হবে।

আবুবকর (রা.) ও ওমর (রা.) এই দু'জনের একজন মাত্র এ উক্তিই করেছিলেন যে, দেখ এ ব্যক্তিটি তোমাদের বাড়ীতে ঘুমের সাথে সাদৃশ্য করছে অর্থাৎ সে এতো ঘুমে অচেতন যে, মনে হচ্ছে যেন সে সফরে নেই বরং বাড়ীতেই রয়েছে। অথচ নবী করীম (সা.) তাদের উভয়কেই গীবতকারী গণ্য করেছেন। এজন্যই ওমর ইবনু আব্দুল আযীয গীবতকারীর সম্পর্কে তদন্ত করতেন। একদা কোন এক ব্যক্তি তার সামনে অপর একজন সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করলে তিনি তাকে বললেন, যদি তুমি চাও আমরা তোমার এ বিষয়ে দৃষ্টি দিব। যদি তুমি মিথ্যুক হও তবে এ আয়াতের আওতাভূক্ত হবে।

إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوْا-

"যদি কোন পাপাচারী তোমাদের নিকট কোন সংবাদ নিয়ে আসে, তবে তা নিরীক্ষা কর। [হুজুরাত ঃ ৬] আর যদি তুমি সত্যবাদী হওয়া তবুও এই আয়াতের আওতাভূক্ত হবে, هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيْمٍ- "যে ব্যক্তি পশ্চাদে নিন্দা করে বেড়ায় এবং একজনের কথা অন্যজনের নিকট লাগিয়ে বেড়ায়। ক্বালাম ঃ ১১]। আর যদি চাও আমরা তোমাকে ক্ষমা করে দিব। তখন সে লোকটি বলল, ক্ষমা করুন হে আমীরুল মুমেনিন! আর কখনো এর পুনরাবৃত্তি করব না।[১৮]

মুসলিম ব্যক্তির মান-সম্মান রক্ষা করার ফযীলত ঃ

মুসলিম ব্যক্তির মর্যাদা সবকিছুর শীর্ষে। একদা ইবনু ওমর (রা.) কা'বাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'হে কাবা! তুমি কতইনা মহান, তোমার সম্মান কতইনা মহান, কিন্তু তোমার চেয়েও মুমিন ব্যক্তি বেশী মর্যাদাসম্পন্ন।'[১৯]

---

[১৭] মুসলিম, ছাহীহ সুনানু আবুদাউদ হা/১০৩৪; ছহীহুল জামে' হা/৬২৫০।
[১৮] আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃঃ ২৯২।
[১৯] তিরমিযী, ইবনু হিব্বান প্রভৃতি, হাদীছ হাসান দ্রঃ গায়াতুল মারাম হা/৪৩৫।

নবী করীম (সা.) বলেন,

مَنْ رَدَّ عَنْ عَرْضِ أَخِيْهِ كَانَ لَهُ حِجَابًا مِّنَ النَّارِ-

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জত-আব্রু রক্ষা করবে এটা তার জাহান্নাম থেকে রক্ষাকারী আড় স্বরূপ হয়ে যাবে।[২০] অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا مُرْفُوْعًا: مَنْ ذَبَّ عَنْ عَرْضِ اَخِيْهِ بِالْغَيْبَةِ كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُّتِقَهُ مِنَ النَّارِ-

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) বলেন, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অনুপস্থিতে তার ইজ্জতের পক্ষ থেকে প্রতিহত করবে, আল্লাহর পবিত্র দায়িত্ব হয়ে যাবে তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করা'।[২১]

যে সকল ক্ষেত্রে গীবত করা বৈধঃ

গীবত করা সাধারণভাবে হারাম হলেও এমন কিছু ক্ষেত্র রয়েছে, যেখানে গীবত করা বৈধ, আবার কোন সময় ওয়াজিবও হয়ে যায়। গীবত করা যেসব স্থানে বৈধ সে স্থানগুলি নিম্নে ব্যাখ্যাসহ পরিবেশিত হল ঃ

اَلْقَدْحُ لَيْسَ بِغِيْبَةٍ فِى سِتَّةٍ * مُتَظَلِّمٍ، مُعَرِّفٍ مُحَذِّرٍ وَمُجَاهِرٍ فِسْقًا وَمُسْتَفْتٍ * وَمَنْ طَلَبَ الْاِعَانَةَ فِى إِزَالَةِ مُنْكَرٍ-

ছয় জনের ক্ষেত্রে সমালোচনা করা গীবত নয়- যে মযলূম, যে পরিচয়দানকারী, যে সতর্ককারী, যে প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত, যে ফৎওয়া তলব করে, তলব করে, যে সাহায্য চায় গর্হিত কাজ দূরীভূত করার জন্য।'[২২]

---

[২০] ছহীহুল জামে'হা/৬১৩৯।

[২১] আহমাদ, ত্বাবারাণী, আবু নু'আইম ফিল হিলায়াহ, হাদীছ ছহীহ। দ্রঃ ছহীহুল জামে' হা/৬২৪০; গায়াতুল মারাম হা/৪৩১; ছাহীহ আত-তারগীব।

[২২] শরহুল আক্বীদা আত-ত্বাহাবিয়া, আলবানীর ভূমিকা দ্রঃ আমসিক আলাইকা লিসানাকা, পৃঃ ৫১।

মযলূম ব্যক্তির জন্য গীবত করা বৈধ ঃ এটা কুরআন মাজীদের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لاَّ يُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعاً عَلِيماً-

'কারো ব্যাপারে কোন মন্দ কথা প্রকাশ করা আল্লাহ পছন্দ করেন না, তবে যে নির্যাতিত তার কথা ভিন্ন। আর আল্লাহ হলেন সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। [নিসা ঃ ১৪৮]

২. পরিচয়দানকারী ঃ অনেক সময় পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যক্তির দোষ-গুণ বলতে হয়। যেমন বলা হয় অমুক অন্ধ হাফেজ, অমুক খোঁড়া মানুষ। প্রয়োজনের তাকীদের পরিচয়ের নিমিত্তে এ ধরনের দোষ-গুণ বলা জায়েয আছে। তবে শুধু পরিচয়ের জন্যই বলা যাবে। এর সাথে তাকে খাট করা উদ্দেশ্য জড়িত হলে, তা হারাম বলে পরিগণিত হবে।

হাদীসে এসেছে, ছাহাবী উবনু উম্মে মাকতূম (রা.) সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি একজন অন্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নামাযের আযান দিতেন না, যতক্ষণ না তাকে বলা হত, আপনি সকাল (ফজর) করে ফেলেছেন। আপনি সকাল (ফজর) করে ফেলেছেন।[২৩]

মুসলিম শরীফে এসেছে, নবী করীম (সা.)-এর দু'জন মুওয়াযযিন ছিল; বেলাল এবং অন্ধ সাহাবী ইবনু উম্মে মাকতূম।[২৪] অত্র হাদীসে ইবনে মাকতূমকে নিছক পরিচিতির জন্য অন্ধ বলা হয়েছে।

৩. নছীহত করা ঃ মানুষের কল্যাণ কামনার উদ্দেশ্যে বখাটে ও মন্দ লোকদের অনিষ্ট থেকে ভীত প্রদর্শন ও সতর্ককরণ কল্পে তাদের দোষ-গুণ বলা বৈধ। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন-

اَلدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لله وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ-

'দ্বীন ইসলাম উপদেশের উপর ভিত্তিশীল। (রাবী তামীম দারী বলেন) আমরা বললাম, কাদের জন্য (এই উপদেশ)? তদুত্তরে তিনি বললেন,'আল্লাহর জন্য,

---

[২৩] বুখারী হা/৬১৭।
[২৪] ছহীহ মুসলিম, 'ছিয়াম' অধ্যায়, হা/৩৮।

তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমামাদের জন্য এবং তাদের সাধারণ লোকদের জন্য।[২৫]

মুহাদ্দেছীনে কেরামের বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে সমালোচনা এ প্রকার বৈধ গীবতেই অন্তর্ভূক্ত। এ প্রকার গীবত করা ওয়াজিবও বটে। এজন্য কোন কোন মুহাদ্দিস বলতেন, আসুন আমরা আল্লাহর ওয়াস্তে কিছুক্ষণ গীবত করি। (হাদীছ শাস্ত্রের গ্রন্থাদি দ্রঃ) আল্লামা শাওকনী (রহ.) বলেন, এই ধরণের সমালোচনা করা ওয়াজিব। *[দ্রঃ রফউর রীবাহ ফীমা ইয়াজুযু ওয়ামা লা ইয়াজুযু মিনাল গীবাহ]*

নাবী করীম (সা.) নিজেই এই প্রকার সমালোচনা করেছেন। নিম্নে এ বিষয়ের কয়েকটি হাদীস পরিবেশিত হলো ঃ

নবী করীম (সা.) কতিপয় লোক সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন,

مَا أَظُنُّ فُلاَنًا وَفُلاَنًا يَعْرِفُ مِنْ دِيْنِنَا شَيْئًا-

'আমার মনে হয় না যে, অমুক অমুক আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জানে।[২৬]

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট একজন ব্যক্তি আসার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন, তাকে অনুমতি দাও। এ লোকটি তার গোত্রের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ ভাই বা সন্তান। সে প্রবেশ করলে নবী করীম (সা.) তার সাথে খুব নরম ভাষা ব্যবহার করলেন। তিনি বললেন, আয়েশা! নিশ্চয়ই সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সেই যাকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে তার ফাহেশী কথা ও কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য।[২৭]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহ.) বলেন, বিদ'আতী নেতৃবৃন্দের মতই কুরআন হাদীস বিরোধী কথা ও ইবাদতকারীগণের অবস্থা বর্ণনা করা ও তাদের থেকে উম্মতকে সতর্ক করা সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। এমনকি ইমাম আহমাদ (রহ.) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, একজন ব্যক্তি ছিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে, ই'তেকাফ করে। তার থেকে এ কাজটি আপনার নিকট বেশী প্রিয়,

---

[২৫] মুসলিম, হা/১২।
[২৬] বুখারী, আদব অধ্যায়, হা/৬০৬৭।
[২৭] ছহীহ বুখারী, 'আদব' অধ্যায়, হা/৬০৫৬; ছহীহ মুসলিম হা/২৫৯১।

নাকি এটা বেশী প্রিয় যে, সে বিদ'আতীদের সম্পর্কে কথা বলবে (ও মানুষকে সতর্ক করবে)? উত্তরে তিনি বলেন, যদি সে সালাত, ই'তেকাফ প্রভৃতি করে, তবে সেটা তার জন্যই করে থাকে। কিন্তু যদি সে বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তবে তা সমস্ত মুসলিমদের স্বার্থে হবে। সুতরাং এটাই তদপেক্ষা উত্তম।[২৮]

৪. প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত ব্যক্তির সমালোচনা করা বৈধ ঃ এটা হারাম গীবতের অন্তর্ভূক্ত নয়। যেমন প্রকাশ্য মদখোর, ডাকাত, গুণ্ডা এদের সমালোচনা করাতে কোন দোষ নাই। ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহ.) বলতেন, ফাসেকের ক্ষেত্রে কোন গীবত নেই অর্থাৎ তাদের গীবত করা দোষের কিছু নয়।

হাসান বছরী হতে বর্ণিত তিনি বলেন, বিদ'আতীর যেমন কোন গীবত নেই, অনুরূপভাবে প্রকাশ্য ফাসেকীতে লিপ্ত ব্যক্তিরও কোন গীবত নেই।[২৯]

৫. ফৎওয়া তলবকারী ও সু-পরামর্শ দানকারীঃ ফৎওয়া তলব করতে গিয়ে কারো দোষ, গুণ আলোচনা করার প্রয়োজন দেখা দিলে, তার জন্য তার বলা বৈধ। তবে নিয়ত বিশুদ্ধ থাকতে হবে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হিন্দা (রা.) নবী করীম (সা.)-এর দরবারে এসে অভিযোগ করে বলেন, 'নিশ্চয় আবু সুফইয়ান (স্বীয় স্বামী) একজন কৃপণ ব্যক্তি, সে আমার ও আমার সন্তানের জন্য যা যথেষ্ট তা দেয় না। এমতাবস্থায় আমি যদি তার অজান্তে কোন কিছু নিয়ে ফেলি, তাতে কি আমার কোন গুণাহ্ হবে? নবী করীম (সা.) তাকে বললেন, তোমার ও তোমার ছেলে-মেয়ের জন্য যা যথেষ্ট হয় তা নিয়ে নিবে পরিমিতভাবে। অনুরূপভাবে যদি কেউ কারো কাছে কারো সম্পর্কে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে কি-না এ সম্পর্কে সুপরামর্শ চায়, তবে তাকে অবশ্যই তার দোষ-গুণ বলে দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, اَلْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمِنٌ 'যার নিকট পরামর্শ তলব করা হয়, সে একজন আমানতদার'।[৩০]

---

[২৮] মাজমূউল ফাতাওয়া ২৮/২২১

[২৯] ইমাম লালকাঈ, শারহু উছুলে ইতেক্বাদে আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ ১/১৪০ পৃঃ দ্রঃ মাওক্বেফু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ মিন আহলিল আহওয়া ওয়াল বিদ'আহ ২/৪৯৬ পৃঃ।

[৩০] সুনান চতুষ্টয়, আহমাদ, হাকেম, তাহাবী, দারেমী, ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে' হ/৬৭০০।

নবী করীম (সা.)-এর কাছে ফাতেমা বিনতু ক্বায়েস (রা.) বললেন, তাকে মু'আবিয়া ও আবু জাহাম বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, 'মু'আবিয়া হল ফক্বীর। তার কোন সম্পদ নেই। আর আবু জাহাম এর বৈশিষ্ট্য হল, সে কাঁদ থেকে লাঠি (মাটিতে) রাখে না। অর্থাৎ স্ত্রীদেরকে অধিক মার-ধর করে। বরং তুমি উসামাকে বিবাহ কর'।[৩১]

৬. যে ব্যক্তি গর্হিত কাজ অপসারণের জন্য ক্ষমতাসীন মহল থেকে সাহায্য তলব করে তার জন্য প্রয়োজনে গীবত করা বৈধ। যেমন কেউ কোন মহল্লার কোন মাস্তানের উৎপাতে অতিষ্ট। এমতাবস্থায় ঐ এলাকায় মাস্তানদের তৎপরতা বন্ধের জন্য থানায় তাদের পরিচয় ব্যক্ত করা বৈধ। মোটকথা স্বাভাবিকভাবে গীবত করা হারাম হলেও উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে গীবত করা জায়েয আছে।

তবে একথা সকলের জেনে রাখা উচিত যে, উল্লিখিত বৈধ গীবতের জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। তাহল নিয়ত ঠিক থাকা আর প্রয়োজন দেখা দেওয়া।[৩২] অর্থাৎ নিয়তের মধ্যে যদি কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা উদ্দেশ্য হয়, তবে তা গীবতই হবে। বিনা প্রয়োজনে সমালোচনার আশ্রয় নিলে তাও গীবতের মধ্যে গণ্য হবে। সুতরাং আমাদের সকলের অপরিহার্য কর্তব্য জিহ্বাকে সংযত রাখা।

গীবতকারীর তওবাঃ

গীবতকারীর তওবার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে-

১. কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হওয়া।

২. ঐ কর্ম পুনরায় সম্পাদন না করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা।

৩. ঐ গুণাহ হতে বিরত থাকা।

৪. যার গীবত করা হয়েছে তার নিকটে ক্ষমা চাওয়া। যেমন- আবুবকর ও ওমর (রা.) এবং তাদের খাদেমের ঘটনা যা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। ক্ষমা তলব করতে গিয়ে যদি ফিৎনা হয়, তবে সরাসরি ক্ষমা চাওয়ার দরকার নেই; বরং তার জন্য ক্ষমার দোআ করবে এবং তার কুৎসা রটানোর পরিবর্তে তার প্রশংসা করবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ তার তওবা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হবে।[৩৩]

---

[৩১] মুসলিম 'তালাক' অধ্যায় হা/১৪৮০।
[৩২] আল- হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম, পৃঃ ২৯০।
[৩৩] আমসিক আলায়কা লিসানাকা, পৃঃ ৫৭।

গীবত সম্পর্কে সালাফে ছালেহীনের কিছু উক্তি ঃ

১. ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, 'তোমরা আল্লাহর যিকির করবে কারণ তা আরোগ্য স্বরূপ। মানুষের দোষ-গুণ উল্লেখ করা হতে বিরত থাকবে। কারণ সেটা ব্যাধি স্বরূপ'।

২. ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, 'যখন তুমি তোমার সাথীদের দোষ-ত্রুটি উল্লেখ করার ইচ্ছা কর, তখন তুমি তোমার দোষ-ত্রুটির কথা স্মরণ করবে'।

৩. আমর ইবনুল আছ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি একদা একটি মৃত খচ্চরের পার্শ্ব অতিক্রমকালে তার কিছু সাথীদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, 'কোন ব্যক্তির জন্য অপর মুসলিম ভাইয়ের গোশত ভক্ষণ অপেক্ষা এই এই গাধাটির গোশত খেয়ে উদর ভর্তি করাই উত্তম'।

৪. হাসান বছরী (রহ.) হতে বর্ণিত, তাকে জনৈক ব্যক্তি বলল, আপনি আমার গীবত করছেন। তদুত্তরে তিনি বললেন, 'তোমার মর্যাদা আমার নিকটে এমন পর্যায়ে পৌছেনি যে, আমি তোমাকে আমার নেকী সমূহের হাকিম বানাব। (অর্থাৎ তোমাকে স্বাধীনতার দিব আমার নেকী নিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে, আমার নিকটে তুমি এমন মর্যাদায় উপনীত হওনি')।

৫. কথিত আছে, কোন এক বিদ্বানকে বলা হল, অমুক ব্যক্তি আপনার গীবত করেছে তখন তার নিকটে তিনি তাজা খেজুর ভর্তি একটি প্লেট পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, আমার নিকটে এ মর্মে সংবাদ পৌছেছে যে, আপনি আমাকে আপনার নেকীগুলি হাদিয়া দিয়েছেন। সুতরাং আমিও তার কিছু বদলা দেওয়ার চেষ্টা করলাম। আমাকে ক্ষমা করুন। কারণ আমি আপনার ঐ নেকীগুলির বদলা পূর্ণাঙ্গরূপে দিতে অক্ষম।

৬. ইবনুল মুবারক (রহ.) বলতেন, যদি আমি কারো গীবত করতাম তবে অবশ্যই আমার পিতা-মাতারই গীবত করতাম। কারণ তারাই আমার নেকী পাওয়ার বেশী হকদার।[৩৪]

---

[৩৪] আমসিক আলায়কা লিসানাকা, পৃঃ ৫৮-৫৯।

পরনিন্দাসহ যে কোন গর্হিত কথা হতে জবানকে আয়ত্বে রাখার ফযীলতঃ

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি তার লজ্জাস্থান ও জবানকে আয়ত্বে রাখার যামিন হবে, আমি তার জন্য জান্নাতের যামিন হব। [বুখারী ও মুসলিম]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ اَفْضَلُ؟ قَالَ كُلُّ مَخْمُوْمِ الْقَلْبِ، صُدُوْقِ لِلسَّانِ، قَالُوْا صُدُوْقِ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُوْمُ الْقَلْبِ؟ قَالَ هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ الَّذِيْ لاَ اِثْمَ فِيْهِ وَلاَغِلَّ وَلاَحَسَدَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করা হল, কোন ব্যক্তি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বললেন, 'যে মাখযুমুল ক্বালব এবং সত্যভাসী জিহ্বা। তারা বললেন, আমরাতো জানি সত্যভাষী কাকে বলে? এবার বলুন, 'মাখযুমুল ক্বালব' কাকে বলে? তিনি বললেন, সে হলো পূত-পবিত্র পরহেযগার ব্যক্তি, যার মধ্যে কোন পাপ নেই, খেয়ানত নেই, হিংসা-বিদ্বেষ নেই।[৩৫]

অত্র হাদীস থেকে আমরা জানতে পারলাম, গীবত বা পরনিন্দা না করার কি ফযীলত। সুতরাং আসুন অহেতুক কারো গীবত না করি এবং সালাফে ছালেহীনের ন্যায় আমরাও স্বীয় অন্তরকে পরিস্কার রাখি। আল্লাহ আমাদেরকে সেই তাওফীক্ব দিন।

[৩৫] ইবনু মাজাহ হা/৪২১৬; হাদীছ ছহীহ, ২/৪১১।

ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ

জেনে রাখুন, ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়সমূহ দশটি ঃ

প্রথম ঃ আল্লাহর ইবাদতে শিরক করা। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا-

অর্থ ঃ "নিশ্চয় আল্লাহ শিরকের অপরাধ ক্ষমা করেন না কিন্তু এর চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।" [সূরা নিসা ঃ ৪৮][৩৬]

---

[৩৬] আল্লাহ বলেন, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر : ٢)

অর্থঃ তোমার প্রতিপালকের জন্য ছলাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। [সূরাহ্ কাওছার-১] রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لعن الله من ذبح لغير الله (رواه مسلم) "যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্য পশু যবেহ করে তার প্রতি আল্লাহ অভিশম্পাত করেছেন। [মুসলিম]। সুতরাং এ পশু জবাই বা কুরবানী যদি কোন ব্যক্তি ও বস্তুর উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে তবে বড়শিরক বলে গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করা, সাহায্য চাওয়া, কাউকে ভয় করা, অন্যের উপর ভরসা করা, অন্যের উদ্দেশ্যে মানত-মানসা করা, অন্যকে উপকার ও অপকারের মালিক মনে করা, আল্লাহর যেমন ক্ষমতা, আরো কারো এরূপ ক্ষমতা রয়েছে বিশ্বাস করা ইত্যাদি সবই শিরক। উল্লেখিত বিষয়গুলির দলীল নিম্নরূপ ঃ

আল্লাহ বলেন ঃ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا-(سورة الجن)

"আর নিশ্চয় মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য, সুতরাং তার সাথে আর কাউকেও আহ্বান করো না। [সূরা জ্বিন ঃ ১০]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (الجن:٢٠)

"বলুন ঃ শুধু আমার প্রতিপালকের নিকটেই প্রার্থনা করি আর তার সাথে কাউকেও শরীক করি না। [সূরাহ জ্বিন ঃ ২০]

الدعاء هو العبادة (صحيح ابى داود)

"দু'আই হচ্ছে ইবাদাত [ছহীহ আবূ দাউদ ঃ ১৩২৯]

সুতরাং দু'আ বা প্রার্থনা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট করা যাবে না।

আল্লাহ বলেন ঃ اياك نعبد واياك نستعين "আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি এবং শুধু তোমারই সাহায্য চাই।"

তিনি আরও বলেছেন,

اَنَّهُ مَنْ يُّشْرِكْ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهِ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ اَنْصَارٍ-

অর্থ ঃ "নিশ্চয় যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করবে আল্লাহ তার জন্যে জান্নাতকে হারাম করে দিবেন আর তার আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম। আর যালিমদের কোন সাহায্যকারী নেই।" [সূরা মায়েদাহ ঃ ৭২]

শিরকের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারোর উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা। যেমন জ্বিন অথবা কবরের উদ্দেশ্যে পশু জবাই করা।

দ্বিতীয় ঃ যে ব্যক্তি নিজের মধ্যে এবং আল্লাহর মধ্যে মাধ্যম সাব্যস্ত করল, তাদের ডাকল, সুপারিশ কামনা করল, তাদের উপর ভরসা করল সে সকলের ঐক্যমতে কুফরী করল।[৩৭]

"إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله"

"যখন কিছু চাইবে আল্লাহর নিকট চাইবে এবং যখন সাহায্য ভিক্ষা করবে তখন একমাত্র আল্লাহর নিকট সাহায্য ভিক্ষা করবে"। (হাদীছটি ইমাম আহমাদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ বলেন ঃ فلا تخافوهم وخافون ان كنتم مؤمنين (آل عمران)

"খবরতার তোমরা তাদেরকে ভয় করবে না, আমাকে ভয় করবে যদি তোমরা মু'মিন হও। [আলে ইমরান- ১৭৫]

[৩৭] (১) দলীল ঃ আল্লাহ বলেন-

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَـــؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ-

"আর তারা আল্লাহ ব্যতীত (অনেক বিষয়ে) এমন ব্যক্তি ও বস্তুর উপাসনা করে যারা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না? তারা বলে ওরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী, বলুন, তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনের মধ্যেকার এমন সংবাদ দিতেছ যা তিনি জানেন না, আল্লাহ মহা পবিত্র এবং যার সঙ্গে তারা শরীক স্থাপন করে তার থেকে উর্ধে। [সূরা ইউনুস ঃ ১৮]

আল্লাহ অন্যত্র বলেন ঃ

তৃতীয় ঃ যে ব্যক্তি মুশরিকদের কাফির মনে করে না অথবা তাদের কাফির হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করে অথবা তাদের ধর্মকে সঠিক মনে করে সে কুফরী করল।[৩৮]

চতুর্থ ঃ যে ব্যক্তি মনে করে যে, অন্যের হেদায়েত (পথ নির্দেশনা) নবীর (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হেদায়াতের চেয়ে পরিপূর্ণ অথবা তার বিধান নবীর বিধানের চেয়ে উত্তম। উদাহরণ স্বরূপ যে ব্যক্তি তাগুতের বিধানকে নবীর বিধানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে সে কাফির।[৩৯]

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى-

"আর যারা তাঁকে ব্যতীত ওলী আউলিয়া ধারণ করেছে (এবং প্রার্থনা ও মান্নত মানসা ইত্যাদি ইবাদত সাব্যস্ত করে) তারা বলে আমরা তাদের উপাসনা করি শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে পৌছিয়ে দিবে"। [সূরা যুমার ঃ ৩]

[৩৮] (১) দলীল ঃ

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءاؤُا مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ-

"নিশ্চয় ইবরাহীম এবং যারা তার সাথে ঈমান এনেছে তাদের মাঝে তোমাদের" জন্য উত্তম আদর্শ নিহিত রয়েছে। যখন তাঁরা তাঁদের সজাতিকে বলেছিলেন, নিশ্চয় আমরা তোমাদেরকে অস্বীকার করলাম। আর আমাদের মাঝে ও তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বৈরীতার সূচনা হলো যে পর্যন্ত তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। [সূরা মুমতাহিনাহ্ ঃ ৪]

[৩৯৩৯] দলীল ঃ আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً-

"আপনি কি ওদেরকে দেখেননি যারা এ দাবী করে যে, আপনার নিকট এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি তারা ঈমান এনেছে তদুপরি তারা ত্বাগুদের নিকট বিচার কামনা করে অথচ তাদেরকে তা অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। আর শয়তান চাই তাদেরকে দূরতম ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত করতে। যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো, তখন মুনাফিকদেকে দেখে থাকবেন তারা আপনার থেকে চরমভাবে বিমুখ হচ্ছে। [সূরা নিসা ঃ ৬০-৬১]

আল্লাহ আরো বলেন ঃ

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ-

পঞ্চম ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম) আনীত কোন বিধানকে অপছন্দ করল সে কুফরী করল- যদিও সে ওটি নিজে আমল করে।[৪০]

ষষ্ঠ ঃ যে ব্যক্তি রাসূলের (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দ্বীনের কোন কিছুকে অথবা ছওয়াব অথবা 'আযাব নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করল সে কুফরী করল।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ اَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُوْنَ- لاَ تَعْتَذِرُوْا قَدْ كَفَرْتُمْ-

অর্থ ঃ "বলুন, তোমরা কি আল্লহ, তাঁর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর রাসূলকে নিয়ে ঠাট্টা করছিলে? ওযর কর না। তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গিয়েছ। [তাওবাহ্ ঃ ৬৫-৬৬]

সপ্তম ঃ যাদু এর মধ্যে রয়েছে- ভেলকিবাজী এবং ভালবাসা সৃষ্টি করে বলে কথিত রিং। যে ব্যক্তি এ কাজ করল অথবা এতে সন্তুষ্ট হল সে কুফরী করল। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ اَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ-

"তারা দু'জন কাউকে শিক্ষা দেয় না যতক্ষণ না তরা বলে আমরা পরীক্ষা বৈ আর কিছু নই অতএব, কুফরী কর না। [বাকারাহ্ ঃ ১০২]

অষ্টম ঃ মুসলমানদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করা ঃ

এর প্রমাণ হচ্ছে আল্লাহর বাণী ঃ

"তারা কি জাহিলিয়্যাতের বিধান কামনা করে, বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহর চেয়ে আর কে উত্তম বিধান দানকারী রয়েছে"। [সূরা মায়েদা, আয়াত ঃ ৫০]

[৪০] (১) দলীল ঃ আল্লাহ বলেন-

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ-

"তা এজন্য যে, তারা আল্লাহকে নাখোশকারী বিষয়ের অনুসরণ করেছে এবং তাকে সন্তুষ্টকারী বিষয়কে ঘৃণা করেছে, যার ফলে তাদের আমলসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছেন। [সূরা মুহাম্মদ, আয়াত ঃ ২৮]

وَمَنْ يَّتَوَلَّهُم مِّنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَهْدِىْ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

অর্থ ঃ "তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদের অন্তর্ভূক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম জাতিকে হেদায়েত করেন না।" [সূরা মায়িদাহ ঃ ৫১]

নবম ঃ যে ব্যক্ত মনে করে যে, কিছু লোক মুহাম্মাদের শরীয়ত থেকে বের হতে পারে, যেমন, খিযির (আ.) মুসা (আ.) এর শরীয়ত থেকে বের হয়েছিলেন- সে কাফির।[৪১]

দশম ঃ আল্লাহর দ্বীন থেকে বিমুখ হওয়া। দ্বীন শিখে না, আমলও করে না।

এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِاٰيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ-

অর্থ ঃ "যে ব্যক্তিকে তার প্রভুর আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দেয়া হয়েছে অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে তার চেয়ে বড় যালিম কে? নিশ্চয় আমি অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণকারী।" [সাজদাহ ঃ ২২]

এসব ইসলাম বিনষ্টকারী বিষয়ের ক্ষেত্রে অবহেলাকারী বা ভারত্বপূর্ণ বা ভয় প্রভাবিতর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় ও বাধ্য তার কথা ভিন্ন। এগুলো সবই অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সচরাচরই ঘটে থাকে। মুসলমানদের উচিত এগুলোকে ভয় করে চলা। যে সব কাজ আল্লাহর ক্রোধ এবং তাঁর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তিকে অপরিহার্য করে দেয় সেগুলো থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাচ্ছি।

---

[৪১] দলীল ঃ আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّٰهِ الإِسْلاَمُ-

নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দ্বীন হলো ইসলাম। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ১৯]
অন্যত্র বলেন-

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

"যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করবে কস্মিণকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ঃ ৮৫]

সুরেশ্বরী

(সুরেশ্বরী পীরেরর আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা)

'সুরেশ্বর' বৃহত্তর ফরিদপুরের শরীয়তপুর জেলার অন্তর্গত নড়িয়া থানার একটি গ্রাম। এখানকার শাহসূফী সৈয়দ আহম্মদ আলী ওরফে হযরত শাহসূফী সৈয়্যদ জান শরীফ শাহ 'সুরেশ্বরী' পীর নামে খ্যাত। তিনি ২রা অগ্রহায়ণ, ১২৬৩ বাংলা, মোতাবেক ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা শরীফ শাহ মেহেরউল্লাহ। ৯ বৎসর বয়সের সময় তিনি কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ১০ বৎসর বয়সে তিনি পীর শাহসূফী সৈয়দ ফতেহ আলী ওয়াইসী- এর নিকট বায়াত গ্রহণ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে ফতেহ্ আলী ওয়াইসী তাকে খেলাফত দান করেন এবং বলেন "হে বাবা জান শরীফ! আমি দেখিতেছি, আরশে মুয়াল্লায় আপনার নাম শাহ আহম্মদ আলী লেখা হইয়াছে। আজ হইতে আপনাকে এই লকব প্রদান করা হইল। আপনাকে কুতবুল এরশাদের নেসবত দান করা হইল। আপনার লেখায় যে আহম্মদী ভাব ও নূরী ধর্মের বিকাশ ঘটিবে, তাহা আপনার বংশ পরম্পরায় আপনার আওলাদগণ কর্তৃক আপনি শেষ যামানার হযরত ইমাম মেহদী (আ.)-এর আর্ভিাবের সম্পূর্ণ অধিকারী এবং সুবিকাশী হইবেন।"[৪২]

সুরেশ্বরী পীর সাহেব ১৮৯২-১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় হেড মোদাররেছ পদে চাকুরী করেন। তিনি ৯ খানা পুস্তক রচনা করেন। সেগুলোর নাম হল ঃ

১. সিররে হক জামে নূর।
২. নূরে হক গঞ্জে নূর।
৩. লতায়েফে সাফিয়া।
৪. মাতলাউল উলূম।
৫. ছফিনায়ে ছফর।
৬. কৌলুল কেরাম।
৭. সরহে সদর।
৮. আইনাইন।

এ পুস্তকগুলোর বেশ কয়েকখানা সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে সুরেশ্বরীর অধস্তন উত্তরাধীকারীগণ কর্তৃক 'খানকায়ে সুরেশ্বরী" ৩৮৫/সি মালিবাগ চৌধুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৭ থেকে "সুরেশ্বর" নামে একটি মাসিক পত্রিকাও প্রকাশিত হয়ে থাকে।

---

[৪২] তথ্যসূত্র ঃ ভূমিকা- ছফিনায়ে ছফর, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯।

www.waytojannah.com

সুরেশ্বরী পীরের লিখিত উপরোল্লিখিত পুস্তকাদি ও মাসিক সুরেশ্বর থেকে সুরেশ্বরীদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যা জানা যায় তা খণ্ডনসহ উল্লেখ করা হল ঃ

১. তাদের মতে সামা, নাচ গান-বাদ্য সবই জায়েয। সুরেশ্বরী পীরের অনুসারীগণ বলেন সুরেশ্বরী সুরকে ভালবাসতেন। সুরের মূর্ছনায় তিনি পরমাত্মার মাঝে লীন হয়ে যেতেন। সূরের প্রতি তার ভালবাসার কারণে সকলেই তাকে সূরের ঈশ্বর বা সুরেশ্বর নামে অভিহিত করেন।[৪৩] মাসিক সুরেশ্বরে গান-বাদ্যের উপর একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছে। তার শেষে লেখা হয়েছে- গান, সামা, বাজনা, হাতের তালি বাজানো ও নৃত্য সবই বৈধ।[৪৪]

খণ্ডন ঃ

নাচ গান শরীআতে হারাম। এ সম্পর্কে "গান-বাদ্য প্রসঙ্গ" শিরোনামে প্রতিপক্ষের দলীলাদি খণ্ডনসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২. তারা সেজদায়ে তাহিয়্যা (সম্মানের সেজদা)-এর প্রবক্তা।

খণ্ডন ঃ

আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও উদ্দেশ্যে সেজদা করা হারাম। চাই ইবাদতের উদ্দেশ্যে সেজদা হোক বা সম্মানের উদ্দেশ্যে হোক।

৩. তারা মাযারে গিলাফ, ফুল, আগরবাতি, মোমবাতি ও গোলাপ জল দেয়ার প্রবক্তা।

খণ্ডন ঃ

এগুলো বিদআত। (দেখুন- কিতাবুল ঈমান, মুফতি মনসুরুল হক)

৪. সুরেশ্বরী লিখেছেন- কবরের মাটি নরম কিংবা সময় গতিকে তাহাতে জল কাদা থাকিলে তাহাতে বিছান কিংবা খাট দেওয়া কর্তব্য। নেক লোকের কবরে খাট দিলেও কোন দোষ নেই।[৪৫]

খণ্ডন ঃ

কুরআন-হাদীছ ও পূর্বসূরীদের থেকে এর কোন প্রমাণ নেই।

৬. সুরেশ্বরী লিখেছেন- মরণের পর যে কয়েকদিন রূহ দোয়া দানের জন্য আসে তাহার নাম তিজা, চাহারম, সপ্তমী, দশই, সাতাইশা, চল্লিশা, ছমাসি ও সাল্‌ইয়ানা।[৪৬]

---

[৪৩] তথ্যসূত্র ঃ ভূমিকা- ছফিনায়ে ছফর, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯। মদিনা কলকী অবতারের ছফিনা।

[৪৪] মাসিক সুরেশ্বর, পৃষ্ঠা ৩৪, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, এপ্রিল, ২০০৩।

[৪৫] ছফিনায়ে ছফর, পৃষ্ঠা ৮৫, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯।

খণ্ডন ঃ

চাহারাম ইত্যাদি দিনে মৃতের রূহ দুনিয়াতে আসা সম্পর্কে হযরত থানবী (রহ.) লিখেছেন- কোন কোন লোকের আকীদা হল শবে বরাত ইত্যাদিতে মৃতের রূহ ঘরে আগমন করে-- এ জাতীয় বিষয় কোন نقلى দলীল ব্যতীত অন্য কোন ভাবে প্রমাণিত হতে পারে না। আর এ জাতীয় বিষয়ে কোন দলীল নেই। কারও কারও আকীদা হল এ রাতে কেউ মুরদাদেরকে ছওয়াব বখশে না দিলে মৃতগণ তাকে অভিশাপ দেন- এগুলো ভিত্তিহীন।[৪৭]

৫. তাদের আকীদা-বিশ্বাসের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক হল ঃ

(১) সুরেশ্বরী লিখেছেন ঃ পীরের নিকট দীক্ষিত না হইলে কোন ইবাদত কবূল হয় না।

খণ্ডন ঃ

এখানে বাইআত হওয়াকে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য শর্ত তথা ফরয সাব্যস্ত করা হয়েছে। অথচ কোন কিছুকে ফরয সাব্যস্ত করতে হলে কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা (نص صريح) থাকা আবশ্যক। যা এখানে অনুপস্থিত। বাইআত হওয়াকে উলামায়ে কেরাম সুন্নাত বলেছেন। বাইআত হওয়া বা পীর ধরাকে ফরয বলা শরী'আতের মধ্যে কোন দলীল ছাড়া অতিরঞ্জন ঘটানো। যা শরী'আত বিকৃত করার ন্যায় জঘন্য অপরাধ। তবে এসলাহে বাতিন বা আধ্যাত্মিক সংশোধন ফরয। সেটা স্বতন্ত্র কথা।

(২) সুরেশ্বরীর মতে কামেল ওলীর কোন ইবাদত বন্দেগীর প্রয়োজন হয় না।[৪৮]

মালামতি দেখ যারে, রোযা নামায নাহি পড়ে,
আওয়ারেফে দেখ বন্ধুগণ ॥[৪৯]

মাসিক সুরেশ্বরে সুরেশ্বরী রচিত "মাতলাউল উলূম" গ্রন্থ থেকে (অনুবাদক- মাওলানা ফরীদ উদ্দিন আত্তার) উদ্ধৃত করে এ সম্বন্ধে আরও পরিস্কার করে লেখা হয়েছে- "আহ্লুল্লাহ: যাঁরা পুরাপুরিভাবে মহান আল্লাহ পাকের

---

৪৬ ছফিনায়ে ছফর, পৃষ্ঠা ৮৭, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর সৈয়দ শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রাতাগণ কর্তৃক প্রকাশিত, চতুর্থ সংস্করণ ১৯৯৯।

৪৭ اغلاط العوام।-

৪৮ নূরে হক গঞ্জে নূর, পৃষ্ঠা ২৫, সুরেশ্বর দরবার শরীফ-এর পক্ষে শাহ্ নূরে মঞ্জুর মোর্শেদ (মাহবুবে খোদা) ও ভ্রতাগণ কর্তৃক প্রকাশিথ, একাদশ সংস্করণ ১৯৯৮।

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১৩৩।

একত্ববাদের সাথে মিশে গেছেন, তাঁদের নিকট তো ফরয বলতে কিছু নেই। এমতাবস্থায় যাহেরী শরীআতের কোন বালাই থাকে না।"

পত্রিকাটিতে আরও লেখা হয়েছে- আউলিয়া দুই ধরনের।

১. তাসাউফ চর্চাকারী, সূফী- তারা যাহেরী শরী'আতের সাধারণত খিলাফ কোন কাজ করেন না। তবে সময় সময়..... ।

২. মুলামাতিয়াহ্- তাঁরা সাধারণ মানুষের তিরস্কার পছন্দ করেন। তাঁরা যাহেরী শরী'আতের খিলাফ কাজকর্ম করেন। পোষাক-আশাক, খাদ্য-খোরাকী, বাসস্থান-অবস্থান কোন ব্যাপারেই তাদের শরী'আতের পাবন্দী দেখা যায় না। অথচ, তাঁদের মধ্যেই অধিকাংশ গাউস, কুতুব, আবদাল, আখইয়ার হয়ে থাকেন।[৫০]

ইবাদত করা আমরণ দায়িত্ব। কোন স্তরেই এ দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পাওয়া যাবে না। দলীল কুরআনের আয়াত ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ-

অর্থাৎ, মৃত্যু পর্যন্ত তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর। [সূরা হিজর ঃ ৯৯]

একথা সর্বজনবিদিত যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম এবং সাহাবায়ে কেরামের চেয়ে অধিক বিশ্বাস আর কারও হতে পারে না। তথাপি তাদের উপর আমরণ শরী'আত পালনের দায়িত্ব ছিল এবং তাঁরা আমরণ ইবাদত-বন্দেগী পালন করে গিয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর ব্যাপারে কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ إِنِّيْ عَبْدُ اللهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِيْ نَبِيًّا- وَجَعَلَنِيْ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِيْ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا-

অর্থাৎ, সে বলল, আমি (ঈসা) আল্লাহ তা'আলার দাস। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী করেছেন। যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন নামায ও যাকাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। [সূরা মারইয়ারম ঃ ৩০]

---

[৫০] মাসিক সুরেশ্বর, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই ২০০৩ পৃষ্ঠা ১৭।

www.waytojannah.com

মোটকথা, আল্লাহর নবীর সমান ইয়াকীন-বিশ্বাস অর্জন করা কোন উম্মতের পক্ষে সম্ভব নয়। তদুপরি নবীকে আজীবন শরী'আতের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। সেখানে একজন উম্মত এই ক্ষমতা ও স্বাধীনতা কোথায় পেল যে, সে শরী'আতের বিধান হতে মুক্ত, স্বাধীন।[৫১]

* তাদের মতবাদ অনুসারে বলতে হবে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (স.) বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নীত হননি, নতুবা তাঁরা কেন ইবাদত করতেন? যদি তারা মেনে নেন এবং অন্ততঃ রাসূল (সা.)-এর ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবেন যে, রাসূল (সা.) বুযুর্গির উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, তাহলে তিনি এই স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে পা মোবারক ফোলাতে গেলেন কেন?

সূফীকূল শিরোমণি হযরত জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ) কে কোন একজন লোক জিজ্ঞাসা করেছিল, কেউ কেউ বলে থাকে, আমরা তো পৌঁছে গেছি। এখন আর আমাদের শরী'আতের অনুসরণের প্রয়োজন নেই। তিনি উত্তরে বলেছিলেন- وصلوا ولكن الى سقر অর্থাৎ, হ্যাঁ, তারা পৌঁছে গেছে, তবে জাহান্নামে।[৫২]

তিনি একথাও বলেছিলেন যে, "এমনটি বলা যিনা ব্যভিচার, চুরি ও মদ্যপান অপেক্ষাও নিকৃষ্ট।"[৫৩] কেননা, এ সব কাজ গোনাহ এবং মস্ত বড় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও কুফরী তো নয়। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত মতবাদটি সরাসরি কুফরী ও ধর্মহীনতা।[৫৪]

হযরত ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বিশদ ব্যাখ্যাসহ যুক্তির নিরিখে মাজমউল ফাতাওয়ায় আলোচ্য আকীদা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'যারা বলে আমাদের অন্তর পরিস্কার হয়ে গেছে, এখন আমরা যে কাজই করব তাতে কোন অসুবিধা নেই অথবা একথা বলে যে, আমাদের এখন আর নামাযের প্রয়োজন নেই। কেননা আমরা মুল লক্ষ্যে পৌঁছে গেছি। অথবা এরূপ বুলি ছাড়ে যে, আমাদের এখন আর হজ্জ করার দরকার নেই। কেননা, স্বয়ং কা'বা আমাদের তাওয়াফ করে থাকে। কিংবা এমন বলে থাকে যে, আমাদের এখন

---

[৫১] তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, ১৬৮ পৃঃ।

[৫২] তাসাওউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, বরাত- শরহু হাদীছিল ইলম, ইবনে রজম (রহ.)ঃ ১৬ সিরাতুল মুসতারশিদীন ঃ ৮৩ টিকা।

[৫৩] মাজমূউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়াঃ ১১/৪২০।

[৫৪] প্রাগুক্ত।

রোযার প্রয়োজন নেই। কেননা, আমাদের এর কোন দরকার নেই কিংবা এ ধরণের উক্তি করে যে, আমাদের জন্যে মদ্যপান বৈধ। এটা কেবল সাধারণ লোকদের জন্য হারাম। এ ধরণের কথাবার্তা যারা বলে অথবা এ ধরণের আকীদা যারা পোষণ করে, তারা সকল ইমামের মতে সর্বসম্মতিক্রমে কাফের, মুরতাদ। তাদেরকে তাওবা করতে বলা হবে। যদি তওবা করে তাহলে তো ভালই, অন্যথায় তাদেরকে হত্যা করা হবে। আর যদি এ ধরণের আকীদা-বিশ্বাস অন্তরে লুকিয়ে রাখে, তাহলে সে হবে মুনাফিক ও যিন্দিক। অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে একবার এ আকীদা প্রমাণের পর তওবার সুযোগ দেয়া ছাড়াই কতল করে দেয়া হবে। তবে কেউ কেউ তওবার সুযোগ দেয়ার পর হত্যা করার অভিমতও ব্যক্ত করেছেন।[৫৫]

من ز عم ان له مع الله تعالى حالا اسقط عنه نحو الصلوة او تحريم شرب الخمر وجب قتله، وان كان فى الحكم بخلوده ن، وقتل مثله افضل من قتل مأة كافر، لان ضرور اكثر -

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন বিশেষ অবস্থা বা সম্পর্কের দাবী করে ও বলে যে, এ অবস্থায় তার জন্য নামাযের বিধান এবং শুরাপান হারামের বিধান রহিত হয়ে গেছে, তাহলে তাকে কতল করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যদিও তার চিরকাল জাহান্নামে থাকার ব্যাপারে কিছু কথা আছে। উপরোক্ত মতাবলম্বী লোককে হত্যা করা শত কাফেরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম। কেননা, এ ধরণের লোক দ্বারা প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয়ে থাকে।[৫৬]

ইমাম ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) ইমাম গাযালী (রহঃ)-এর উক্তিটি উল্লেখপূর্বক বলেন-

ولا نظر فى خلوده لانه مرتد ، لا ستحلاله ما علمت حرمته اونفيه وجوب ما علم وجوبه ضرورة فيهما ، ومن ثم جزم فى "الانوار" بخلوده-

[৫৫] প্রাগুক্ত ঃ ১১/৪০১-৪০৩।
[৫৬] রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯।

অর্থাৎ, এ ধরনের ব্যক্তির জাহান্নামে চিরকাল থাকার ব্যাপারেও কোন সন্দেহ নেই। কেননা, সে মুরতাদ ও ধর্মত্যাগী। তার কারণ হল সে এমন বস্তুকে হালাল মনে করেছে যার হারাম হওয়া শরী'আতে অকাট্য ও অতি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর এমন বিষয় ফরয হওয়ার কথা অস্বীকার করেছে, যা ফরয হওয়াও শরী'আতে অকাট্য এবং সুস্পষ্টভাবে জ্ঞাত। তাই 'কিতাবুল আনওয়ার'-এ দৃঢ়তার সাথে লেখা হয়েছে যে, এরূপ ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল থাকবে।[৫৭]

* পূর্বে বলা হয়েছে তাদের মতবাদ মেনে নিলে বলতে হবে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সা.) বুযুর্গীর উচ্চস্তরে উন্নীত হননি। নতুবা বলতে হবে তাঁরা বুযুর্গীর উচ্চস্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে কুফরীতের লিপ্ত হয়েছিলেন। আর যে উক্তি দ্বারা রাসূল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামকে কাফের বলা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়, নিঃসন্দেহে সেটা কুফরী উক্তি। আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের সর্বসম্মত আকীদা হল- আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.)-এর মর্যাদা সকলের উর্ধ্বে। অতপর সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা সকল উম্মতের উর্ধ্বে এবং সকল সাহাবী জান্নাতী।

একটি ভ্রান্তির অপনোদন ঃ

বাতিলপন্থীরা কামেল ও বুযুর্গ হয়ে গেলে ইবাদত লাগে না- এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা তাদের ভ্রান্ত মতবাদের পক্ষে দলীল দিয়ে থাকে ঃ

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ-

অর্থাৎ, তোমরা মৃত্যু পর্যন্ত ইবাদত করতে থাকে। [সূরা হিজর ঃ ৯৯]

তারা এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে বলে থাকে যে, এখানে 'ইয়াকীন' (.....) শব্দটি পরিচিতি ও বিশ্বাস অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেমতে আয়াতের অর্থ হল তোমরা মারেফত বা পরিচিতি অর্জন হওয়া পর্যন্ত ইবাদত কর। অতএব খোদার সাথে গভীর পরিচিতি লাভ হওয়ার পর আর ইবাদতের প্রয়োজন থাকে না।

তাদের এ অপব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তাফসীরে ইবনে কাছীরে বলা হয়েছে-

---

[৫৭] তাসাউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, বরাত- রুহুল মাআনী ঃ ১৬/১৯।

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى ان المراد يا ليقين المعرفة فمتى وصل احدهم الى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم وهذا كفر وضلال وجهل ، فان الانبياء عليهم السلام كانوا هم واصحابهم اعلم الناس بالله واعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا اعبد وكثر الناس عبده ومواظبة على فعل الخيرات حين الوفاة ، وانما المراد باليقين ههنا الموت- (تفسير ابن كثير جـــ٢.

অর্থাৎ, এ আয়াত দ্বারা কাফেরদের ভ্রান্ত আকীদা খন্ডন করা হয়েছে, যারা বলে যে, ইয়ক্বীন অর্থ মা'রেফত (পরিচিতি)। তাদের মতে কারও মা'রেফত হাসিল হলে তার ইবাদত মওকূফ হয়ে যায়। তাদের এ আকীদা কুফর, পথভ্রষ্টতা ও মুর্খতা। কারণ নিশ্চয়ই নবী (আ.) গণ এবং তাঁদের সাহাবাগণ আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সবচেয়ে বড় আলেম ছিলেন। আল্লাহ তা'আলার হক, তাঁর ছিফাত এবং তাযীমের মুস্তাহিক হওয়ার মা'রেফাত তাঁদের সবচেয়ে বেশী ছিল। এতসত্ত্বেও তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত সকলের চেয়ে বেশী ইবাদতকারী ছিলেন, সর্বদা নেক কাজ করে গেছেন। বস্তুতঃ এখানে 'ইয়াক্বীন' অর্থ মউত ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে-

حتى يأتيك اليقين اى الموت كما روى عن ابن عمر والحسن وقتادة وابن زيد..... فليس المراد به مازعمة بعض الملحدين مما يسمونه بالكشف والشهود وقالوا : ان العبد متى حصل له ذالك سقط عنه التكليف بالعبادو وهى ليس الا للمحجوبين ولقد مرقوا بذالك من الدين وخرجوا من ربقة الاسلام وجماعة المسلمين- (روح المعانى ٨: ٧٨)

অর্থাৎ, حتى يأتيك اليقين বাক্যে ইয়াক্বীন অর্থ যে, মৃত্যু, একথা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) হাসান বসরী (রহঃ), কাতাদাহ (রহ.) ও ইবনে যায়েদ হতে বর্ণিত আছে- এখানে ইয়াক্বীনের ঐ অর্থ নয় যা কাফেরেরা (মুলহিদরা) বলে থাকে; অর্থাৎ কাশফ ও মোশাহাদা। তারা বলে যে, বান্দার যখন কাশ্‌ফ ও মোশাহাদা হাসিল হয়, তখন আর তার কোন ইবাদত লাগে না। ইবাদত হল কাশ্‌ফ মোশাহাদা যাদের নেই তাদের জন্য। তারা এ আকীদার দরুন ইসলাম ধর্ম হতে বের হয়ে গেছে।

তারা এ কথা বুঝতে পারেনি যে, উক্ত আয়াতে প্রথমতঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাসল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ আনি ইয়াকীন (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত স্বীয় প্রভূর ইবাদত করতে থাকুন। এখন যদি ইয়াকীন দ্বারা মারেফাতের কোন নির্দিষ্ট স্তর বুঝানো হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে স্তর হাসিল ছিলই। তদুপরি তিনি ওফাত পর্যন্ত ইবাদতে অটল ছিলেন এবং কঠিন রোগেও নামাযের ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়েছেন।

আর যদি (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে স্তর হাসিল না থেকে থাকে, তাহলে সে স্তর কোন উম্মতের হাসিল হওয়া সম্ভব নয়। কেননা, কোন উম্মত আল্লাহ তা'আলার ঐ মারেফাত ও বিলায়াত স্তরে পৌছতে পারে না, সে স্তরে নবী-রাসূলগণ পৌছেছেন!। বুঝা গেল- এখানে ইয়াক্বীন দ্বারা মা'রেফাতের কোন স্তর উদ্দেশ্য হওয়া সম্ভব নয়, বরং ইয়াক্বীন দ্বারা এখানে উদ্দেশ্য হল মৃত্যু; যা হাদীছ ও উম্মতের ইজমা দ্বারা প্রমাণিত।[৫৮]

এ আয়াত দ্বারা তারা দলীল দিতে পারে না বরং আহলে হক এ আয়াত দ্বারা দলীল দিতে পারেন এবং দিয়ে থাকেন। তাদের মতে এ আয়াতই প্রকৃষ্ট দলীল যে, মানুষ আমরণ আল্লাহ তা'আলার ইবাদতের মুকাল্লাফ (আদিষ্ট)। কারণ উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, উক্ত আয়াতে ইয়াক্বীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমনটি সূরা মুদ্দাছছিরে (আয়াত ঃ ৪৭) ইয়াক্বীন শব্দটি মৃত্যু অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা, প্রত্যক্ষ ইয়াক্বীন তথা বিশ্বাস মৃত্যুর পরই হাসিল হয়ে থাকে। স্বয়ং মৃত্যুই এমন এক বিশ্বাস্য বস্তু, যার ব্যাপারে মানুষের সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্ধ ও সংশয় নেই।

---

[৫৮] মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে তাইমিয়া ঃ ১১/৪১৮-৪২০, শরহুল ফিক্‌হিল আকবার- মোল্লা আলী ক্বারী ঃ ১২২, তাফসীরে ইবনে কাসীর ঃ ২/৬১৭, রুহুল মা'আনী ঃ ১৪//৮৭-৮৮।

তারা যাহেরী শরী'আত ও বাতেনি শরী'আত বলে দুইটা শরী'আত দাঁড় করেছেন। এর কোন দলীল কুরআন-হাদীছে নেই। তদুপরি শরী'আত থেকে তরীকতকে পৃথক করে নিলে শরী'আত তথা শরী'আতের বিধি-বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়, যা শরী'আতকে রহিত সাব্যস্ত করার নামান্তর। এ ধরনের বিকৃতি সাধনকারী লোকদেরকে বলা হয় মুলহিদ বা যিন্দিক।

প্রসঙ্গে সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতবী (রহ.)-এর একটি যুক্তিপূর্ণ বিশদ আলোচনার সারাংশ সামান্য ব্যাখ্যাসহ উল্লেখ করা হল। তিনি বলেন- "যিন্দীকদের একটি দল এমন তাসাওউফের কথা বলে, যার ফলে শরী'আতের বিধানাবলীকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয়করে দেয়া হয় তারা বলে, "শরীআতের এসব বিধান নির্বোধ ও সাধারণ লোকদের জন্যে। আওলিয়ায়ে কেরাম ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ শরী'আতের এসব বিধানের মুখাপেক্ষী নন। (বর্র তার এসব কিছুর উর্ধ্বে)। কারণ তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তাদের অন্তরে যা কিছুর উদ্রেক হয়, তাই তাঁদের থেকে কাম্য'- এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফরী কথা। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তাদেরকে কতল করে দিতে হবে। তওবাও তলব করা হবে না। কেননা, এ মতবাদের মধ্যে শরী'আতের একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সে আকীদাটি হল- আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অবগতির কোন উপায় নেই। আর শরী'আতের কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পরিস্কার কুফর।[৫৯]

যা হোক, শরী'আত ও তরীকতের মধ্যে ব্যবধানকারী, শরী'আত-পরিপন্থী কোন তরীকত অবলম্বনকারী দ্বীন হতে খারেজ।

(৩) দেওয়ানবাগী, চন্দ্রপুরী ও মাইজভান্ডারীদের ন্যায় এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা মনে করেন আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, সুরেশ্বরীর বক্তব্য থেকেও বোঝা যায় তিনি অনুরূপ আকীদা পোষণ করেন। তিনি "সিরে হক্ক জামে নূর" গ্রন্থে লিখেছেন- আহাদ ও আহমাদ- এর মীমের মধ্যে পার্থক্য কেবল হামদ ও নাতের জন্য।[৬০]

---

[৫৯] القرطبى جـ/١١ . صفحـ/٢٩-٢٨، فتح البارى جـ/١. صفحـ/٢٦٧.

[৬০] তথ্যসূত্র ঃ মাসিক সুরেশ্বর পৃষ্ঠা ২৭, ৪র্থ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, মার্চ ২০০৩।

www.waytojannah.com

খণ্ডন ঃ

আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার ব্যাখ্যা যদি এই হয় যে, তাঁদের সত্ত্বা এক ও অভিন্ন, তাহলে এটা নিঃসন্দেহে কুফরী আকীদা। আর যদি এটার ব্যাখ্যা হয়ে থাকে এই যে, আল্লাহ রাসূলের মধ্যে অবতারিত হন বা আত্মপ্রকাশিত হন, অর্থাৎ রাসূলগণ হচ্ছেন আল্লাহর প্রকাশ বা আল্লাহর অবতার, তাহলে এটাকে বলা হয় حلول এর আকীদা। এই আকীদাও কুফ্‌রী। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল আল্লাহর সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হন না বা প্রবেশ (حلول) হন না এবং তাঁর সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দুরীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেছিলেন অর্থাৎ অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষপাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ.. করেন অর্থাৎ অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলূলিয়া (حلولي) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফরী। মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী বলেন- যেসব মুর্খ লোক বলে, আল্লাহর খাস ওলীগণ আল্লাহর সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, মেন বরফ পনির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্‌র।[৬১]

উল্লেখ্য ঃ যারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, তারা এ বিষয়ে সাধারণত .....বা "সর্বেশ্বরবাদ"- দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(৪) রাসূল (সা.) ইলেমে গায়েবের অধিকারী। মাসিক সুরেশ্বর লেখা হয়েছে- সৃষ্টির আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সব বিষয়ই তাঁর মোবারক নয়নের সামনে বিদ্যমান। তিনি এলমে গায়েবের অধিকারী।[৬২]

খণ্ডন ঃ

এ সম্পর্কে "নবী করীম (সা.)-এর গায়েব জানা প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। (কিতাবুল ঈমান, মুফতি মনসুরুল হক)

সারকথা সুরেশ্বরী পীর একাধিক কুফরী আকীদা পোষণকারী। যা পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

---

[৬১] عقائد الاسلام عبدالحق حقانى

[৬২] মাসিক সুরেশ্বর, পৃষ্ঠা ৮, ৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, জানুয়ারী, ২০০৩।

www.waytojannah.com

এনায়েতপুরী

(এনায়েতপুরী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস)

"এনায়েতপুরী" বলতে বোঝানো হয়েছে সিরাজগঞ্জের এনায়েতপূরের পীর মাওলানা শাহ ছূফী মোহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরীকে। তার পিতার নাম মাওলানা শাহ ছুফী আবদুল করীম। তিনি ১৩০০ হিজরীর ১১ই জিলহজ্জ মোতাবেক ২১শে কার্তিক ১২৯৩ সালে সিরাজগঞ্জ (সাবেক পাবনা) জেলার চৌহালী থানার এনায়েতপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫ই জমাদিউস সানী ১৩৭১ হিজরী মোতাবেক ১৮ই ফল্গুন ১৩৫৮ সালে ইন্তেকাল করেন। তিনি সৈয়দ ওয়াজেদ আলী (কলিকাতা)-এর মুরীদ ও খলীফা ছিলেন।[৬৩]

এনায়েতপুরীদের মতে হযরত মাওলানা শাহছূফী মোহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী ১৩০০ হিজরীর মোজাদ্দেদ।[৬৪]

নিম্নে এনায়েতপুরের পীর মাওলানা শাহছূফী মোহাম্মদ ইউনুছ আলী এনায়েতপুরী ও তার অনুসারীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও বিদআত-কুসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে কিছুটা বিবরণ প্রদান করা গেল।

১. এনায়েতপুরী সাহেব মনে করেন তার বংশের সকলেই মাদারজাত ওলী। এনায়েতপুরী সাহেব ইন্তেকালের কয়েকদিন পূর্বে বলেছেন, "আমার বংশের তেফেল শিশু বাচ্চাকেও যদি তোমরা পাও, তাহাকে মাদারজাত ওলী মনে করিও।"[৬৫]

২. কিছু কিছু বাতিল ফিরকার ভ্রান্ত ধারণা হল আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আল্লাহ হলেন 'আহাদ' আর রাসূল হলেন 'আহমদ'। এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটা 'মীম' হরফের। এনায়েতপুরীদের ধারণাও অনুরূপ বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের রচিত নিম্নোক্ত কবিতা তার **প্রমাণ ঃ**

---

[৬৩] তথ্যসূত্র ঃ 'ওজিফা ও উপদেশ', সম্পাদক ঃ পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দীন- সাজ্জাদনসীন এনায়েতপুর ও "খাজা ইউনুসিয়া নকসেবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ওজিফা", সম্পাদনায় ঃ এম. মকবুল হোসেন-খাদেম খাজাবাবা এনায়েতপুরী।

[৬৪] "ওজিফা ও উপদেশ", সম্পাদক ঃ পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দীন- সাজ্জাদনসীন এনায়েতপুর, পৃঃ ৯

[৬৫] "খাজা ইউনুসিয়া নকসেবন্দিয়া মোজাদ্দেদিয়া তরিকার ওজিফা", সম্পাদনায় ঃ এম মকবূল হোসেন-খাদেম খাজাবাবা এনায়েতপুরী, ২য় সংস্করণ, অক্টোবর-২০০২ পৃঃ ২৫।

www.waytojannah.com

বানাইয়া নূর নবী দেখাইলেন আপনা ছবি
সেই নবীজীর চরণ বিনে নাইগো পরিত্রাণ
আহাদে আহম্মদ বানাইয়ে, মিমকা পদ মাঝে দিয়ে
খেলতিয়াছেন পাক বাড়ি হইয়া বে-নিশান।[৬৬]

খণ্ডন ঃ

নবী রাসূলদের সম্বন্ধে সহীহ ঈমান হল তাঁরা মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর (অবতার) নন বরং তাঁরা খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব-আল্লাহর বাণী অনুসারে জ্বিন ও মানবজাতিকে হেদায়েতের জন্য তারা দুনিয়াতে প্রেরিত হন। অতএব, উপরোক্ত ধারনা ঈমান পরিপন্থি ধারণা।

রাসূল (সা.) আল্লাহর মাখলূক। তাঁরা আল্লাহর সাথে মাখলূকের অভিন্নতার মত পোষণ করে মাখলূককে খালেক সাব্যস্ত করেছে। আর খোদার কোন মাখলূককে খোদা সাব্যস্ত করা কুফ্‌রী। তাছাড়া রাসূল (সা.) সম্পর্কিত ধারণা জরূরিয়াতে দ্বীন (ضروريات)-এর[৬৭] অন্তর্ভূক্ত। হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্দহলবী বলেন- এ ধরণের ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান (تاويل) এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এ ধরণের বিষয়কে অস্বীকার করা কূফরী।

রাসূল আর খোদার ভিতর কোন পার্থক্য নেই বললে আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তানাদি আছে বলতে হবে। কেননা রাসূল (সা.)-এর স্ত্রী ও সন্তানাদি তখন আল্লাহর স্ত্রী ও সন্তানাদি বলে আখ্যায়িত হবে। নাউযুবিল্লাহ"

আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল আল্লাহর সত্ত্বা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হননা বা প্রবেশ (حلول) করেন না এবং তাঁর সত্তার মধ্যেও কেউ মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেছিলেন অর্থাৎ, অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষ পাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেন অর্থাৎ অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলুলিয়া (حلوليه) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফ্‌রী। মাওলানা

---

[৬৬] পুষ্পহার, মৌঃ মোঃ আব্দুর রহমান মোজাদ্দেদী, মোয়াজ্জেম- দরবার শরীফ এনায়েতপুর, পৃঃ ৩৬, ১২তম সংস্করণ, বাং ১৪০৮।

[৬৭] এটি একটি পরিভাষা, এর ব্যাখ্যার জন্য দেখুন ১৯৪ পৃষ্ঠা

আবদুল হক হক্কানী বলেন- যেসব মুর্খ লোকেরা বলে, আল্লাহর খাস ওলীগণ আল্লাহ্‌র সত্ত্বার এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পানির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্‌র।[৬৮]

উল্লেখ্য ঃ পূর্বেও বলা হয়েছে- যারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন, বা মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, তারা এ বিষয়ে সাধারণত وحدة الوجود বা 'সর্বেশ্বরবাদ"- দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে "সবেশ্বরবাদ/ সর্বখোদাবাদ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[

৩. "একশত ত্রিশ ফরয" শিরোনামে লেখা হয়েছে- হযরত মোহাম্মদ (সা.) -এর ৪ কুরছি জানা ৪ ফরয। চার কুরছীর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে রাসূল পিতৃ পুরুষ ৪ জন।

১। মোহাম্মদ (সা.) আব্দুল্লাহর পুত্র।

২। আব্দুল্লাহ আব্দুল মোতালেবের পুত্র।

৩। আব্দুল মোতালেব হাসেমের পুত্র।

৪। হাসেম আব্দুল মন্নাফের পুত্র।

আরও লেখা হয়েছে চার মাজহাব মানা ৪ ফরয।[৬৯]

উপরোক্ত নামগুলি জানাকে তারা ফরয সাব্যস্ত করেছেন। অথচ কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত কোন কিছুকে ফরয বলে সাব্যস্ত করা যায় না। আর এ ব্যাপারে কুরআনের কোন বর্ণনা নেই। এটা শরী'আত সম্পর্কে তাদের চরম অজ্ঞ থাকার প্রমাণ। যেটা ফরয নয় সেটকে ফরয সাব্যস্ত করা শরী'আতে বিকৃতি সাধনের অপরাধ। আর মাযহাব মান্য করা তথা তাক্‌লীদ করাকে আইম্মায়ে কেরাম ওয়াজিব বলেছেন। যে ইমামেরই হোক যে কোন একজনেরই তাকলীদ করা ওয়াজিব। এটাকেও ফরয সাব্যস্ত করা তদুপরি চার ইমামের তাক্‌লীদকে চার ফরয সাব্যস্ত করা শরী'আত সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ থাকার প্রমাণ।

---

[৬৮] عقائد الاسلام عبد الحق حقانى ।

[৬৯] শরীয়তের আলো, খাজা বাবা এনায়েতপুরী (র.) এর অনুমোদন ক্রমে মওলানা মোঃ মাকিম উদ্দিন প্রণীত। প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) পুনঃ মুদ্রণ ঃ ১৪০৭ সাল, পৃঃ ৩৮-৩৯।

৪. তারা পীর সম্পর্কে অতিরঞ্জনের শিকার। যেমন ঃ

(১) তাদের মতে পীর ধরা ফরয। অথচ কুরআনের স্পষ্ট বর্ণনা ব্যতীত কোন কিছুকে ফরয বলে সাব্যস্ত করা যায় না। এনায়েতপুরী বলেন- "পীর ধরা সবার জন্য ফরয।"[৭০]

"পীরের অছিলা ধরার বয়ান" শিরোনামে নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা পীর ধরার স্বপক্ষে তারা দলীল পেশ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর ওছীলা অর্থাৎ নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর [সূরা মায়িদা ঃ ৩৫]

কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও পীর ধরা ফরয এ মর্মে দলীল পেশ করেছেন-

وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُّرْشِداً-

অর্থাৎ, তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার কোন পথপ্রদর্শনকারী পবে না। [সূরা কাহ্ফ ঃ ১৭]

তারা বলেন ঃ পবিত্র কালামে মাজীদের এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাহার কোন কামেল মোরশেদ নাই, সে নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট।[৭১]

রাসূল (সা.)- এর হাতে কোন কোন সাহাবী কর্তৃক জিহাদ করা, চুরি, যেনা না করা প্রভৃতি বিষয়ের উপর বাই'আতের কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে উলামায়ে কেরাম বাইআতে সুলূক তথা পীর-মুরীদির বাইআত প্রমাণিত করেছেন। অতএব পীর গ্রহণ করাকে সুন্নাত বলা যেতে পারে। কিন্তু

---

[৭০] তরিকতের ওজিফা শিক্ষা, মৌঃ মোঃ আবদুর রহমান মধুপুরী, মোয়াজ্জেম দরবার শরীফ এনায়েতপুর, প্রকাশনায় লেখক, ৭ম সংস্করণ, ১৪০৫ সন, পৃঃ ২৬।

[৭১] গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (র.)-এর অনুমোদনক্রমে মোঃ মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, পৃঃ ৪৩।

www.waytojannah.com

কোনক্রমেই ফরয নয়। পীর ধরাকে ফরয বলা শরী'আতে বাড়াবাড়ি বৈ কিছু নয়। পূর্বোক্ত আয়াতে যে الوسيلة শব্দটি এসেছে, সাধারণভাবে মুফাসসিরীন কেরাম তার দ্বারা ইবাদত-বন্দেগী উদ্দেশ্য নিয়েছেন। কোন কোন মুফাসসির তার মধ্যে শায়খ গ্রহণের বিষয়টিকেও অন্তর্ভূক্ত করা যায় মর্মে মত দিয়েছেন। এর অর্থ হল শব্দটি পীর ধরার ব্যাপারে দ্ব্যর্থহীন নয়। আর কুরআনের দ্ব্যর্থহীন অর্থ বিশিষ্ট কোন ভাষ্য ছাড়া কোন ফরয প্রমাণিত করা যায় না। আর দ্বিতীয় আয়াতের সাথে মুর্শিদ ধরার বিষয়টি কোনভাবেই সম্পর্কিত নয়।

(২) এনায়েতপূরীগণ পীরের মধ্যে তাওয়াজ্জুহ দিয়ে মানুষের মধ্যে পরিবর্তন এনে দেয়ার ক্ষমতার প্রবক্তা। তাদের মতে এনায়েতপুরী পীর সাহেবের মধ্যে "তাওয়াজ্জুহে ইত্তেহাদী"-র ক্ষমতা ছিল। যে সে পীরে তাওয়াজ্জুহ্ দিতে পারে না। যাঁহাকে আল্লাহ এত্তহাদী তাওয়াজ্জুহ্ দানের ক্ষমতা দিয়েছেন, তিনি যদি ঐ তাওয়াজ্জুহ্ কাহাকেও দান করেন, তবে প্রবল অগ্নির ন্যায় মুহুর্তের মধ্যে তাহার দেলের যাবতীয় ময়লা জ্বালাইয়া দিয়া তাহার দেল পাক ও ছাফ করিয়া দেয়। তখন লতীফা আল্লাহ আল্লাহ নামে হেলিতে (নড়া চড়া করিতে) থাকে।[৭২]

তার মধ্যে এমন ক্ষমতা থাকলে দুনিয়ার সকলকে তিনি পাক ছাফ করে দিলেন না কেন? এরূপ ক্ষমতা কি রাসূল (সা.)-এর ছিল? থাকলে তিনি কেন সকলকে হেদায়েত করতে পারলেন না? কেন আল্লাহ তাআলা বললেন- তুমি চাইলেই কাউকে হেদায়েত করতে পার না বরং আল্লাহ যাকে চান হোদায়েত করেন। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّكَ لاَ تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ-

অর্থাৎ, তুমি যাকে চাও হেদায়েত করতে পার না বরং আল্লাহ যাকে চান হোদয়েত করেন। [সূরা কাসাস ঃ ৫৬]

---

[৭২] গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (র.)-এর অনুমোদনক্রমে মোঃ মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, পৃঃ ৭৯।

(৩) এক শ্রেণীর ভ্রান্ত লোক আছেন যারা মনে করেন আল্লাহ তা'আলা পীর বুযুর্গদেরকে সন্তান দান করা, ব্যবসা-বাণিজ্যে আয়-উন্নতি দান করা, মানুষের মাকসূদ পূর্ণ করা ইত্যাদির ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন। পীর সাহেবদের কাছে চাইলে তারা মানুষের এসব মাকসূদ পূর্ণ করে দিতে পারেন। ভাল-মন্দের ক্ষমতা পীরের হাতে আছে। এনায়েতপুরীগণও অনুরূপ ধারণা রাখেন বলে প্রতীয়মান হয়। তাদের নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ। পীর সাহেব এনায়েতপুরীর উদ্দেশ্যে তার সাহেবজাদা লিখেছেন ঃ

খাজা তোমার দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে
খাজা তোমার পাক রওজায় এসে যদি কেউ কিছু চায়
চাইতে জানলে রয়না কাঙ্গাল অফুরন্ত ভাণ্ডারে।[৭৩]

এনায়েতপুরীর মুরীদ ও খলীফা আটরশির পীর সাহেব বলেছেন- এনায়েতপুরী (কুঃ) ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়েছেন, "বাবা, তোর ভাল-মন্দ উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নাই।"[৭৪]

খণ্ডন ঃ

এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা পরিপন্থী। এটা কুরআন সহীহ্ ও হাদীছে পরিস্কার ভাবে যা বলা হয়েছে, তার বিরোধী। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ فَمَا لِهَـؤُلاَءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثاً-

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। এই সম্প্রদায়ের কি হল যে, এরা কোন কথা বুঝতেই পারে না। [সূরা নিসা ঃ ৭৮]

---

[৭৩] পুষ্পোদ্যান, পীরজাদা খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) লেখক কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ৭৬।

[৭৪] শাহসূফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত, ক্রমিক নং ৩, পৃঃ ১১১, প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ, ১লা মে-১৯৯৯।

www.waytojannah.com

হাদীছে বলা হয়েছে-

ولخير ولشر كله بيديك

অর্থাৎ, ভাল-মন্দ সবই তোমার (আল্লাহর) হাতে।
অতএব, সকলের ভাল-মন্দ আল্লাহর হাতে, কোন মানুষের হাতে নয়।
(৪) তারা এনায়েতপুরী পীরকে প্রায় নবীর সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেন। তাদের ধারণায় যে ব্যক্তি এনায়েতপুরীর সাক্ষাৎ পেয়েছে, সে জান্নাতী। তাদের রচিত নিম্নোক্ত কবিতা তার প্রমাণ ঃ

গৌছল আজম খাজা তুমি আউলিয়া ছরদার
তোমাকে দিয়াছেন আল্লাহ রহমাতের ভাণ্ডার।
পাইলে তোমার দেখা জান্নাত নছীব তার ॥[৭৫]

৫. তাদের মতে সামা জায়েয।[৭৬] সামা সম্পর্কে "সামা প্রসঙ্গ" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃঃ ৫৫৮।

৬. তারা ওরস-এর প্রবক্তা। শুধু প্রবক্তাই নয়, ওরস সম্পর্কিত ধারণার ব্যাপারে তাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রয়েছে। আটরশির পীর সাহেব এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- শরীফ কাজা করিলে পরবর্তী এক বছরের জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। যাবতীয় আয়-উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।"[৭৭]
৭. এনায়েতপুরী সাহেব বলেছেন- এই তরিকায় মৌখিক যেকের বা উচ্চস্বরে যেকের করার নিয়ম নাই।[৭৮]

এই বক্তব্য অবশ্যই কুরআন হাদীছ বিরোধী। কারণ কুরআন হাদীছে যে যিকর করার কথা এসেছে, তার মধ্যে অবশ্যই মৌখিক যিক্‌র অন্তর্ভূক্ত।

*****

[৭৫] পুষ্পহার, মৌঃ মোঃ আব্দুর রহমান মোজাদ্দেদী, মোয়াজ্জেম- দরবার শরীফ এনায়েতপুর, ১২তম সংস্করণ, বাং ১৪০৮ পৃঃ ৩৭, ।
[৭৬] গাঞ্জে আছরার বা মা'রেফাত তত্ত্ব, খাজাবাবা এনায়েতপুরী (র.)-এর অনুমোদনক্রমে মোঃ মকিম উদ্দীন প্রণীত, প্রকাশক পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দিন (নূহ মিয়া) ১০ম সংস্করণ, ১৪০৯ সাল, পৃঃ ৯৮।
[৭৭] শাহসূফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত, ক্রমিক নং ৩, পৃঃ ১১১, প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্বজাকের মঞ্জিল, খণ্ড ২১, পৃঃ ৪৯, সংস্করণ ৩য়, ৫ই জুন- ২০০১।
[৭৮] "ওজিফা ও উপদেশ", সম্পাদক ঃ পীরজাদা মৌঃ খাজা কামাল উদ্দীন- সাজ্জাদননসীন এনায়েতপুর, পৃঃ ৩৬।

www.waytojannah.com

আটরশি

(আটরশির পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস)

"আটরশি পীর" বলতে ফরিদপুর শহরের নিকটস্থ আটরশি বিশ্বজাকের মঞ্জিল-এর প্রতিষ্ঠাতা শাহসুফী হাশমত উল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। তিনি এনায়েতপুরের পীর শাহসুফী মুহাম্মদ ইউনুস আলী এনায়েতপুরীর মুরীদ ও খলীফা। জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেব জামালপুর জেলার অন্তর্গত শেরপুর থানার পাকুরিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম শাহ আলীম উদ্দীন। জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেবের বয়স যখন পাঁচ/ছয় বৎসর, তখন নোয়াখালীর মাওলানা শরাফত আলী সাহেবের নিকট আরবী, ফার্সীর প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। এতটুকুই তার নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। দশ বৎসর বয়সের সময় তার পিতা তাকে এনায়েতপুরীর পীর শাহ সুফী ইউনুস আলীর খেদমতে অর্পণ করেন। ত্রিশ বৎসর যাবত তিনি এনায়েতপুরী সাহেবের কাছে থাকেন। অতপর এনায়েতপুরী সাহেবের নির্দেশে ফরীদপুরে এসে "জাকের ক্যাম্প" নামে একটি ক্যাম্প স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে এটারই নাম দেয়া হয় "বিশ্বজাকের মঞ্জিল"।[৭৯]

আটরশির পীর জনাব হাশমত উল্লাহ সাহেব কর্তৃক লিখিত একখানা বইয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। সেটি হল "বিশ্বজাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্ধতি"। এছাড়া বিশ্বজাকের মঞ্জিল কর্তৃক "শাহ সুফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত" নামে তার বয়ান ও নসিহত সমূহের সংকলন বের করা হয়েছে বাইশ খণ্ডে। এই খণ্ডসমূহের আলোচনার সিংহভাগ মা'রেফাত সংক্রান্ত মাকাম, লতীফা, ছায়ের উরূয ইত্যাদি তাসাওউফের নানান পরিভাষা সংক্রান্ত বিষয় এবং অনেকটা আবোধগম্য আলোচনায় ভরা। যে সব বিষয় সম্পর্কে কুরআন-হাদীছে স্পষ্ট কোন তথ্য পাওয়া যায় না। যেগুলি কোন বুযর্গের কাশফ এবং অনেকের কল্পনার সমষ্টি, যা অন্য কারও জন্য দলীল নয়। তদুপরি এইসব বক্তব্যকে সমর্থিত করার জন্য তিনি কুরআন-হাদীছ থেকে যে সব দলীলের অবতারণা করেছেন; তার মধ্যে বহু সংখ্যক মওযূ' বা জাল হাদীছ বিদ্যমান।

---

[৭৯] তথ্য সূত্র ঃ বিশ্বজাকের মঞ্জিলের পরিচালনা পদ্ধতি, শাহসূফী ফরিদপুরী ও সংক্ষিপ্ত ওজিফা, মাহফুযুল হক, প্রকাশনায় বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, ২০ তম সংস্করণ।

www.waytojannah.com

আবার রয়েছে বাতিনী সুফীদের ন্যায় অগ্রহণযোগ্য তাবীল বা অপব্যাখ্যা। তার এসব নসিহতের বইতে বিদ্যমান জাল হাদীছের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হল, যেগুলি হাদীছ নয় বরং প্রচলিত কথা বা কোন ব্যক্তি বা কোন সুফীর কথা; অথচ তিনি সেগুলোকে অবলিলায় হাদীছ বলে চালিয়ে দিয়েছেন। কুরআন হাদীছ সম্পর্কে জ্ঞান-স্বল্পতাই এর অন্যতম কারণ।

(١) موتو قبل ان تموتوا- قال ابن حجر : انه ليس بثابت ، وقال القارى: من كلام الصوفية- (كذافى المقاصد الحسنة وكشف الخفاء مزيل الالباس-)

(٢) من عرف نفسه فقد عرف ربه- قال النووى : انه ليس بثابت ، وقيل هو قول يحيى بن معذ الرازى ، وقال لان تيمية : موضوع- (كذا فى المقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الالباس-)

(٣) كنت كنزا لا اعرف فاحببت ان عرف فخلقت خلقا. الحديث- قال ابن تيمنة : انه ليس من كلام النبى (ص) ولايعرف له سند صحيح ولا ضعيف وكذا قال ابن حجر والزركشى- (كذا فى الالى المصنوعة للسيوطى المقاصد للسخاوى وكشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلونى-)

(٤) قلوب المؤمنين عرش الله- قال الصغانى موضوع-(كشف الخفاء ومزيل الالباس للعجلونى-)

(٥) لولاك لما خلقت الافلاك- قال الصغانى موضوع- (ايضا)

এ ধরনের বহু জাল হাদীছ তার বক্তব্যের সর্বত্র বিদ্যমান।

তার এসব বই এবং বিশ্ব জাকের মঞ্জিল থেকে প্রকাশিত অন্যান্য কয়েকটি বই থেকে তার ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জানা যায় তা নিম্নরূপ ঃ

১. পীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা ঃ

পীর সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত ধারণা তাদের একটি প্রধান বিভ্রান্তি। যেমন ঃ

(এক) ভাল-মন্দ পীরের হাতে।

আটরশির পীর সাহেব বলেছেন ঃ "এনায়েতপুরী (কুঃ) ছাহেব তিরোধানের পূর্বে আমাকে বলিয়া গিয়াছেন, "বাবা, তোর ভাল ও মন্দ- উভয়টাই আমার হাতে রইল। তোর কোন চিন্তা নেই।"[৮০]

খণ্ডন ঃ

এনায়েতপুরী সাহেবের আকীদাও অনুরূপ ছিল। পূর্বে এনায়েতপুরী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এটা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা পরিপন্থী। এটা কুরআন ও সহীহ্ হাদীছে পরিস্কার ভাবে যা বলা হয়েছে, তার বিরোধী। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللهِ فَمَا لِهَـؤُلاءِ الْقَوْمِ لاَ يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حَدِيْثًا–

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে। এই সম্প্রদায়ের কি হল যে, এরা কোন কথা বুঝতেই পারে না। [সূরা নিসা ঃ ৭৮]
হাদীছে বলা হয়েছে-

ولخير ولشر كله بيديك

অর্থাৎ, ভাল-মন্দ সবই আল্লাহর হাতে কোন মানুষের হাতে নয়।
উল্লেখ্য ঃ এ শ্রেণীর লোকেরা পীরকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়ে পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করেছে। তাই ভল-মন্দ সম্পাদন করার খোদায়ী গুণ

---

[৮০] শাহসুফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত, খণ্ড নং ৩, পৃঃ ১১১, প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তাফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৩য় মুদ্রণ, ১লা মে-১৯৯৯।

www.waytojannah.com

পীরের মধ্যে থাকাকে সাব্যস্ত করেছে। আর পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি- যারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন বা মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রবেশ করার মত পোষণ করেন, বা পীর মাশায়েখকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন, তারা এ বিষয়ে সাধারণত وحدة الوجود বা 'সর্বেশ্বরবাদ'-দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে অত্র অধ্যায়ের শেষভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ৫২৫।

(দুই) পীর পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবে ঃ

আটরশির পীর সাহেব বলেন ঃ "দুনিয়াতে থাকাবস্থায় তোমরা খোদা প্রাপ্তির পথে যে যতটুকুই অগ্রসর হওনা কেন, তোমাদের ছায়ের-ছুলূক যদি জীবৎকালে সম্পন্ন নাও হয়, তবুও ভয় নাই। মৃত্যুর পরে কবরের মধ্যে দুই পূণ্যাত্মা (অর্থাৎ, রাসূলে পাক (সা.) এবং আপন পীর) তোমাকে প্রশিক্ষণ দিবেন। মা'রেফাতের তালিম দিবেন; ফলে হাশরের মাঠে সকলেই আল্লাহর ওলী হইয়া উঠিবেন। এ করণেই বলা হয়- এই তরিকায় যিনি দাখিল হন, তিনি আর বঞ্চিত হন না।"[৮১]

পীর-মাশায়েখগণ মুরীদের পাপের বোঝা বহন করে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন এমন হবে না। এ ধারণাটি খৃষ্টানদের " প্রায়শ্চিত্যের আকীদা" (.....) -এর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। এ আকীদা কুফরী আকীদা। খৃষ্টানগণ মনে করে হযরত ঈসা (আ.) নিজের প্রাণ দিয়ে তার অনুসারীদের মুক্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে-

ولا تزر وازرة وزر اخرى-

অর্থাৎ কেহ কারও পাপের বোঝা বহন করবেনা [সূরা আনআম ঃ১৬৫]

কাজেই পীর ধরলে মুক্তি হবে এমন ধারণা চরম গোমরাহীমূলক আকীদা। তবে হ্যাঁ হক্কানী পীর মাশায়েখের হেদায়েত মেনে চললে তার ফায়দা অবশ্যই রয়েছে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

---

[৮১] শাহসুফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত, খণ্ড নং ৪, পৃঃ ৯৩, প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তাফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৪র্থ মুদ্রণ, ৮ই এপ্রিল-১৯৯৮, ইং পৃঃ ৯৩।

পীর তালীম দিয়ে বা কোনভাবে মুরীদের নাজাতের ব্যবস্থা করতে পারবে- এ ধারণা ভ্রান্ত। কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা না করলে কোন পীর তাকে নাজাত দিতে পরবে না। স্বয়ং নবী করীম (সা.) তার গোত্রের লোক বনু হাশিম, বনু মুত্তালিবসহ নিজ কন্যা ফাতেমাকে পর্যন্ত আহ্বান করে বলেছেন- তোমরা নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেরা কর, আমি তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারব না। ইরশাদ করেছেন-

يابنى هاشم! انقذو انفسكم من النار فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا- يابنى عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار فانى لا اغنى عنكم من الله شيئا- يافاطمة! أنقذى نفسك من النار فانى لااغنى عنك من الله شيئا-(مسلم)

অর্থাৎ হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না। হে বনু আব্দুল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষায় কিছুই করতে পারবনা। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকে রক্ষার জন্য কিছুই করতে পারব না।.....।

(তিন) পীর দুনিয়াতে সব ধরণের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষ করতে পারেন ঃ

আটরশির পীর সাহেব বলেন- মুর্শিদে কামেল তদীয় মুরীদ পৃথিবীর যে স্থানেই থাকুক না কেন সেই স্থানেই তাহাকে কুওতে এলাহিয়ার হেফাযতে রাখিতে পারেন। মুর্শিদে কামেলকে আল্লাহ এইরূপ ক্ষমতা দান করেন। শুধু মুরীদকেই নয় মুরীদের আত্মীয়স্বজন, মাল সামানা, বাড়ী-ঘর যাহা কিছুই খেয়াল করুক, তাহার সব কিছুই আল্লাহ তা'আলার কুওতের কেল্লায় বন্দী করিয়া দেন।[৮২]

---

[৮২] শাহসুফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত, খণ্ড নং ৬, পৃঃ ৩৬, প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তাফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ২য় মুদ্রণ, ১৭ জুলাই ১৯৯৭ইং।

www.waytojannah.com

এ ধারণা স্পষ্টতঃ কুরআন বিরোধী ধারণা। আল্লাহ পাক কারও কোন বিপদের ফয়সালা করলে কেউ তাকে তা থেকে উদ্ধার করতে পারবে না। কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ-

অর্থাৎ, যদি আল্লাহ তোমার কোন অকল্যাণ ঘটান, তাহলে তা হটানোর কেউ নেই। [সূরা ইউনুস ঃ ১০৭]

পীর তার মুরীদ এবং মুরীদের আত্মীয়-স্বজনকে সব ধরণের বিপদ-আপদ থেকে উদ্ধার করতে পারলে আটরশি সাহেবের মুরীদ ও তাদের আত্মীয়-স্বজন কেন পথে-ঘাটে দুর্ঘটনার শিকার হন? কেন তারা আততায়ীর হাতে নিহত হন? কেন তাদের বাড়ী–ঘরে চুরি ডাকাতি হয়?

২. পরকালে মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা নেই ঃ

আটরশির পীর সাহেব বলেন ঃ "হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খৃষ্টানগণ নিজ নিজ ধর্মের আলোকেই সৃষ্টিকর্তার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টাকরতে পারে এবং তাহলেই কেবল বিশ্বে শান্তি আসতে পারে। (আটরশির কাফেলা সংকলনে মাহফুযুল হক, আটরশির দরবার থেকে প্রকাশিত পৃঃ ৮৯, সংস্করণ- ১৯৮৪)[৮৩]

খন্ডন ঃ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। [সুরা আলে ইমরান ঃ ১৯]

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। [সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫]

---

[৮৩] তাসাউফ, তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, পৃঃ ১৪৭, প্রকাশকাল- ২০০০, খৃঃ ১৪২১ হিঃ

রাসূল (সা.) বলেন ঃ

لو كان موسى حيا لما وسعه الاتباعى- (مشكوة عن احمد والبهقى)

অর্থা, মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোন উপায় থাকত না।

৩. চার মাযহাব ও ইমামগণ সম্বন্ধে কটুক্তি ঃ

আটরশির দরবার হতে প্রকাশিত বহু গ্রন্থের প্রণেতা আটরশির প্রসিদ্ধ তাত্ত্বিক লেখক মাহফযুল হক সাহেব লিখেছেন, "ইসলামী আইন ব্যবস্থার বর্তমান অব্যবস্থা ও অবক্ষয়ের জন্য আইন প্রণেতাগণের (ইমামগণের) অনমনীয় নীতি। এই অনমনীয় নীতি অবলম্বনের দ্বারাই ইসলামী আইন প্রণেতাগণ কালক্রমে ইসলামী আইনের মৌলিক কাঠামোর মনগড়া ব্যাখ্যা করিয়া আইনকে একটি অনমনীয় ও বাস্তবতার সহিত সামঞ্জস্যহীন শাস্ত্রে পরিণত করেন।[৮৪]

এখানে সব মাযহাবের ইমামগণকে মনগড়া ব্যাখ্যাদানকারী ও সমস্ত মাযহাবের ফেকাহ শাস্ত্রকে অবাস্তব শাস্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এভাবে সমস্ত মাযহাবের সমস্ত মুসলমানকে শাস্ত্রহীন তথা ধর্মহীন আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথা খুব কম বাতিলপন্থী বলেছে।

৪. ওরস সম্বন্ধে তাদের বাড়াবাড়ি ঃ

ওরস সম্পর্কে তাদের অত্যন্ত বাড়াবাড়ি রয়েছে। আটরশির পীর সাহেব এনায়েতপুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন- "ওরস শরীফ কাজা করিলে পরবর্তী এক বছরের জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাইতে হয়। যাবতীয় আয়-উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়।"[৮৫]

বি:দ্রঃ ওরস অবৈধ হওয়া সম্বন্ধে "ওরস প্রসঙ্গ" শিরোনামে দলীল প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[৮৪] "ইসলামের রূপরেখা" লেখক, মাহফুযুল হক, দ্বিতীয় প্রকাশ, ডিসেম্বর ঃ ১৯৮২, প্রকাশনায় ঃ ইসলামী গবেষণা ও সংস্কৃতি পরিষদ, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল, পৃষ্ঠা নং ২৪।

[৮৫] শাহসুফী হযরত ফরিদপুরী (মাঃ জিঃ আঃ) ছাহেবের নসিহত, খণ্ড নং ২১, পৃঃ ৪৯, প্রকাশকঃ পীরজাদা মোস্তাফা আমীর ফয়সাল মুজাদ্দেদী, বিশ্ব জাকের মঞ্জিল ফরিদপুর, ৩য় সংস্করণ, ৫ই জুন-২০০১।

চন্দ্রপুরী

(চন্দ্রপাড়ার পীর আবুল ফযল-এর চিন্তাধারা)

চন্দ্রপাড়া ফরীদপুর জেলা শহর থেকে অদূরে একটি গ্রাম। এখানকার অধিবাসী মৌঃ সায়্যিদ আবুল ফযল সুলতান আহমদ (মৃত ১৯৮৪ খৃষ্টাব্দ) চন্দ্রপাড়া পীর নামে খ্যাত। তিনি শাহসূফী ইউনুস আলী এনায়েতপুরীর শিষ্য। তিনি দেওয়ানবাগী পীর মাহবূব-এ খোদার পীর ও শ্বশুর।

চন্দ্রপাড়ার পীর আবুল ফযল সুলতান আহমদ-এর ভ্রান্ত মতবাদের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. কোন লোক বড় বুযুর্গ হলে তার আর ইবাদত লাগে না স্বয়ং আবুল ফযল কর্তৃক লিখিত "হাক্কুল ইয়াক্বীন" পুস্তাকের ২৯ পৃষ্ঠায় আছে ঃ

"কোন লোক যখন মাকামে ছুদূর, নাশোর, শামসী, নূরী, কুরবে মাকিনের মোকাম অতিক্রম করিয়া নফসীর[৮৬] মোকামে গিয়ে পৌঁছে, তখন তাহার কোন ইবাদত থাকে না। জয্বার অবস্থায়ও কোন লোক যখন ফানার শেষ দরজায় গিয়ে পৌঁছে, তখনও তাহার কোন ইবাদত থাকে না। এমনকি তখন ইবাদত করিলে কুফরী হইবে। তাসাওউফের বহু কিতাবে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে।[৮৭]

খন্ডন ঃ

* সুরেশ্বরী পীরের আকীদাও অনুরূপ ছিল। পূর্বে "সুরেশ্বরী" পীর-এর আকীদা বিশ্বাস আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণসহ এ আকীদার খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। তবে সুরেশ্বরী পীর এত আগে বেড়ে বলেননি যে, কামেল লোকদের জন্য ইবাদত করা কুফ্রী। যেমনটি চন্দ্রপাড়ার পীর বলেছেন।

* চন্দ্রপাড়া পীরের মতবাদ অনুসারে বলতে হবে সাহাবায়ে কেরাম ও রাসূল (সা.) বুযুর্গীর উচ্চস্তরে উন্নীত হননি নতুবা তাঁরা কেন ইবাদত করতেন? যদি

---

[৮৬] দেওয়ানবাগী মাহবূবে খোদা "আল্লাহ কোন পথে" বইয়ে (২য় সংস্করণ) লিখেছেন ঃ কলবে ৭টি স্তরের মধ্যে নফসীর মর্যাদা সবার উর্দ্ধে। (পৃঃ ৯০) এ থেকে বোঝা গেল চন্দ্রপাড়ার পীরের মতবাদ হল বড় বুযুর্গ হলে তার কোন ইবাদত থাকে না। এমনকি তার জন্য তখন ইবাদত করা কুফরী।

[৮৭] তাসাউফ ঃ তত্ত্ব ও পর্যালোচনা, মুফতী মাহমূদ আশরাফ উসমানী ও মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, ২৪৬ পৃঃ বরাদ- হাককুল ইয়াক্বীন (অনুভবলব্ধ জ্ঞান) দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৭৮,পৃঃ ২৯।

www.waytojannah.com

তারা মেনে নেন এবং অন্ততঃ রাসূল (সা.)-এর ক্ষেত্রে তারা অবশ্যই বলতে বাধ্য হবেন যে রাসূল (সা.) বুযর্গীর উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন, তাহলে নাউযুবিল্লাহ বলতে হবে তিনি এই স্তরে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও ইবাদত করে কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়েছিলেন। এমন আকীদার কুফ্‌রী হওয়ার ব্যাপারে কোনই সন্দেহ নাই।

২. চন্দ্রপাড়ার পীরের দ্বিতীয় ভ্রান্ত মতবাদ হল জিব্রাইল এবং আল্লাহ এক ও অভিন্ন। চন্দ্রপাড়া পীরের জামাতা দেওয়ানবাগী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, "সূফী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ" থেকে প্রকাশিত মাসিক "আত্মার বাণী" (৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) পত্রিকায় আছে- সুলতানিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার ইমাম চন্দ্রপুরী ফরমান ঃ জিব্রাইল বলতে অন্য কেহ নন স্বয়ং হাকীকতে আল্লাহ।[৮৮]

খন্ডন ঃ

জিব্রাইল (আঃ) একজন ফেরেশতা। ফেরেশতা আল্লাহর মাখলূক ও আল্লাহর দাস। অতএব, হযরত জিব্রাইল (আঃ) আল্লাহর মাখলূক ও তাঁর দাস। খালেক আর মাখলূক এক নয়। ফেরেশতাগণ যে আল্লাহর সৃষ্টি তার প্রমাণ হল কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

اَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ اِنَاثًا وَّهُمْ شَاهِدُوْنَ-

অর্থ ঃ অথবা আমি কি ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছিলাম আর তারা প্রত্যক্ষ করেছিল। [সূরা সাফ্‌ফাত ঃ ১৫০]

আর ফেরেশতাগণ যে, আল্লাহর দাস অর্থাৎ তাঁর দাসত্ব করাই ফেরেশতাদের কাজ, তা প্রমাণিত হয় নিম্নোক্ত আয়াত থেকে ঃ

وَجعلوا الملئكة الذين هم عباد الرحمن اناثا-

অর্থাৎ, তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা ফেরেশতাদেরকে নারী গণ্য করেছে। [সূরা যুখরূফ ঃ ১৯]

---

[৮৮] বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মদ শামছুল হক, পৃঃ ২২।

৩. আল্লাহর ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমানী করে ঃ

দেওয়ানবাগ হতে প্রকাশিত আত্মারবাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যার ২৫ নং পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ১৪/১১/৮২ইং এশার সময় জনৈক মুরীদ জিজ্ঞাসা করিল "বাবাজান ইবলিসের গলায় পায়গম্বরী হার হইল কেন?" এর জবাবে চন্দ্রপাড়ার পীর মৌঃ সুলতান আহমাদ বলিলেন, "ইবলিসের অধীনে অসংখ্য ফেরেশতা কাজ করতেছে। চন্দ্রপুরী বলেন, ইবলিস তার অধীনে যে ফেরেশতা আছে তাদের বলতেছে, এই ফেরেশতা তুই এই কর। বিভিন্ন নাম আছে তো, তুমি এইডা বানাও, তুমি ঐডা বানাও। এরে চোর বানাও। ওরে চোট্টা বানাও। ওরে সাধু বানাও। সে হুকুম করতেছে তারা (ফেরেশতারা) বানাইতেছে। [২৬ পৃঃ][৮৯]

একথা থেকে প্রমাণিত হয় যে, চন্দ্রপুরীর মতে আল্লাহর ফেরেশতারা আল্লাহর নাফরমানী করে।

খন্ডন ঃ

আল্লাহর ফেরেশতার সর্বদা আল্লাহর হুকুমের তাবেদারীতে লিপ্ত। তাঁর ইবাদতে লিপ্ত। তাঁরা কখনও আল্লাহর নাফরমানী করে না, আল্লাহ পাক ঘোষণা করেন ঃ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ তা'আলা যা আদেশ করেন তা অমান্য করে না এবং যা করতে আদেশ করা হয় তারা তাই করেন। [সূরা তাহরীম ঃ ৬]

৪. চন্দ্রপাড়ার পীর পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। মাসিক আত্মার বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৬তম পৃষ্ঠায়[৯০] লেখা হয়েছে- চন্দ্রপুরী ফরমাইলেন, "পূণর্জন্ম সম্বন্ধে কুরআনেই আছে-

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-

অর্থাৎ, কিভাবে তোমরা আল্লাহর সাথে কুফরী কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু

---

[৮৯] প্রাগুক্ত. পৃঃ ২৩।

[৯০] বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মদ শামছুল হক, পৃঃ ২২।

ঘটাবেন ও পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, অনন্তর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। [সূরা বাকারাহ ঃ ২৮]

চন্দ্রপুরীর মতে এখানে ثم يحييكم -এর অর্থ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মলাভ করা।

খন্ডন ঃ

জমহুরের মতে এখানে ثم يحييكم -এর অর্থ হাশরে পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হওয়া। আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করা কুফরী।[৯১] পুনর্জন্মবাদ সম্পর্কে অত্র গ্রন্থের প্রথম খন্ডে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন পৃষ্ঠা নং ১১৫।

চন্দ্রপুরীর *تضليل / تكفير* প্রসঙ্গ ঃ

* শারঈ কারণ ব্যতীত ইবাদত ফরয না হওয়ার আকীদা-বিশ্বাস করা কুফরী আকীদা। আর তিনি ইবাদত করাকেই কুফরী বলেছেন। তদুপরি একটি ফরয কাজকে কুফরী ঘোষণা দানও একটি কুফরী। শরহে আকাইদ গ্রন্থে আছে ঃ

ولا يصل العبد ما دام عاقلا بالغا الى حيث يسقط عنه الامر والنهى..... وهذا كفر وضلال-

অর্থাৎ, বান্দা যতক্ষণ সুস্থ মস্তিস্ক বালেগ থাকেত ততক্ষণ যত বড় আবেদ হোক না কেন তার উপর হতে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ রহিত হয় না। রহিত হওয়ার আকীদা কুফ্‌র ও পথভ্রষ্টতা। তারা আল্লাহর মাখলূক ফেরেশতাকে আল্লাহর সাথে অভিন্নতার মত পোষণ করে মাখলূককে খালেক সাব্যস্ত করেছে। আর খোদার কোন মাখলূককে খোদা সাব্যস্ত করা কুফ্‌রী। তাছাড়া জিব্রাঈল (আ.) সম্পর্কিত ধারণা জরূরিয়াতে দ্বীন (*ضروريات دين*)- এর[৯২] অন্তর্ভূক্ত। হযরত মাওলানা ইদ্রীস কান্দহ্‌লবী বলেন ঃ এ ধরনের ক্ষেত্রে কোন ভিন্নতর ব্যাখ্যা প্রদান (*تاويل*) এটাকে অস্বীকার করার নামান্তর। আর এ ধরণের বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্‌রী।[৯৩]

---

[৯১] *كشاف اصطلاحات الفنون*

[৯২] এটি একটি পরিভাষা, জরূরিয়্যাত হচ্ছে এমন পর্যায়ের আম (عوام) খাস (خواص) যা নির্বিশেষে সকলের নিকট সুবিদিত, যা জানার জন্য তেমন কোন লেখাপড়ার প্রয়োজন পড়ে না, মুসলমান মাত্রই যে সম্বন্ধে অবহিত। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিষয়ের ফরয হওয়া, রাসূল (সা.)-এর খতমে নবুওয়াত বা শেষ নবী হওয়া ইত্যাদি। এসবকে জরূরিয়্যাত বলা হয়।

[৯৩] عقائد الاسلام ॥

দেওয়ানবাগী

(দেওয়ানবাগী পীর ও তার চিন্তাধারা)

তার নাম মাহবূবে খোদা। ২৭ শে অগ্রহায়ন, ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৪৯ সালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার আশুগঞ্জ থানাধীন বাহাদুরপুর গ্রামে তার জন্ম। তার পিতা সৈয়দ আবদুর রশীদ সরকার। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষার পর তিনি তালশহর করিমিয়া আলিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া করেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। স্বাধীনতার পর সেনাবাহিনীতে রিলিজিয়াস টিচার পদে চাকুরী করেন ফরিদপুরস্থ চন্দ্রপাড়া দরবারের প্রতিষ্ঠাতা মৃত আবুল ফযল সুলতান আহ্মদ (চন্দ্রপাড়ার পীর) ছিলেন তার পীর এবং শ্বশুর। মাহবূবে খোদা নিজে এবং তার ভক্তবৃন্দ তাকে "সূফী সম্রাট" হিসেবে পরিচয় দিয়ে থাকেন।

তিনি ঢাকার অদূরে দেওয়ানবাগ নামক স্থানে একটি এবং ১৪৭ আরামবাগ ঢাকা-১০০০ তে 'বাবে রহমত' নামে আকেটি দরবার স্থাপন করেছেন। তিনি সূফী ফাউণ্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। যা উপরোক্ত আরামবাগের ঠিকানায় অবস্থিত। উক্ত ফাউণ্ডেশন থেকে তার তত্ত্বাবধানে এবং নির্দেশে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ঃ

১. সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী অবদান আল্লাহ কোন্ পথে?

২. সূফী সম্রাটের যুগান্তকারী ধর্মীয় সংস্কার।

৩. স্রষ্টার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সূফী সম্রাট ঃ আল্লাহকে সত্যিই কি দেখা যায় না ?

৪. বিশ্ব নবীর স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে সুফী সম্রাট ঃ রাসূল (সা.) কি সত্যিই গরীব ছিলেন?

৫. মুক্তি কোন্ পথে?

৬. শান্তি কোন্ পথে?

৭. ওয়াজিফা।

৮. মানতের নির্দেশিকা।

৯. এজিদের চক্রান্তে মোহাম্মাদী ইসলাম।

১০. সুলতানিয়া খাবনাম প্রভৃতি। এ ছাড়া উক্ত ফাউন্ডেশন কর্তৃক 'মাসিক আত্মার বাণী' ও 'সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে থাকে। এসব গ্রন্থ ও পত্রিকার বর্ণনা থেকে দেওয়ানাবাগী সাহেবের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হল ঃ

*** দেওয়ানবাগী সাহেবের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তাধারা-**

১. মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা জরুরী নয়। যেমন 'আল্লাহ কোন পথে" গ্রান্থে লেখা হয়েছেঃ যে কোন ধর্মের লোক তার নিজস্ব অবস্থায় থেকে আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে তাঁর বিধানমত নিজেকে পরিচালিত করতে পারে। তাহলে নামধারী কোন মুসলমানের চেয়েও সে উত্তম। মোটকথা ইসলাম বা মুসলিম কোন ব্যক্তির নাম নয়, এটা আল্লাহ প্রদত্ত নির্দিষ্ট বিধান এবং বিধান পালনকারীর নাম। যে কোন অবস্থায় থেকে এই বিধান পালন করতে পারলেই তাকে মুসলমান বলে গণ্য করা যায়। আর যে কোন কুলে থেকেই এই চরিত্র অর্জন করতে পারলে তার মুক্তি হওয়া সম্ভব। (অর্থাৎ, স্বধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ জরুরী নয়।)[৯৪]

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রমাণ স্বরূপ দেওয়ানবাগী বলেন ঃ আমার এখানে এক ব্যক্তি আসে। সে ভিন ধর্মের অনুসারী। তার ধর্মে থেকেই ওজীফা আমলের নিয়ম তাকে বলে দিলাম। কিছু দিন পর লোকটা এসে আমাকে জানালো- হুজুর একরাত্রে স্বপ্ন আমার রাসূল (সা.)-এর রওজা শরীফে যাওয়ার খোশ নসীব হয়। সেখানে গিয়ে উনার কদম মোবারকে সালাম দিয়ে জানালাম যে, শাহ দেওয়ানবাগী হুজুর কেবলার দরবার শরীফ থেকে এসেছি। নবীজি শায়িত ছিলেন। তিনি দয়া করে উঠে বসলেন। নবীজি তাঁর হাত মোবারক বাড়িয়ে আমার সাথে মোসাফা করলেন। মোসাফা করার পর থেকে আমার সারা শরীরে জিকির অনুভব করতে পারি।..... এখান আমার অবস্থা এই যে, যখন যা কিছু করতে চাই তখন আমার হৃদয়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ চলে আসে-তুমি এভাবে চল।[৯৫]

খন্ডন ঃ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسْلاَمُ

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯] অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ-

---

[৯৪] সূত্র ঃ 'আল্লাহ কোন পথে? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ১১৩-১১৪ ও ১২৫-১২৬।

[৯৫] 'মানতের নির্দেশিকা' পৃঃ ৩১, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০১ ॥

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। [সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫]

রাসূল (সা.) বলেন ঃ

لوكان موسى حيا لما وسعه الاتباعى- (مشكوة عن احمد والبيهقى)

অর্থাৎ হযরত মুসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোন উপায় থাকত না।

২. তিনি জান্নাত, জাহান্নাম, হাশর, মীযান, পুলসিরাত, কিরামান কাতেবীন, মুনকার নাকীর, ফেরেশতা, হুর, তাকদীর, আমলনামা ইত্যাদি ঈমান-আকীদা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়কে অস্বীকার করেছেন। অর্থাৎ এগুলোর তিনি এমন ব্যাখ্যা দিয়েছেন যা এগুলো অস্বীকার করার নামান্তর। 'আল্লাহ কোন্ পথে? গ্রন্থে সে ব্যাখ্যাগুলো বিদ্যমান। উক্ত গ্রন্থে প্রথমে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত এ সব বিষয়ে যে আকীদা-বিশ্বাস রাখেন সেগুলোকে প্রচলিত ধারণা[৯৬] বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, তারপর আল্লাহপ্রাপ্ত সাধকগণের বরাদ দিয়ে সেগুলোর এমন অর্থ বলা হয়েছে যা এগুলোকে অস্বীকার করার নামান্তর। যেমন- বলা হয়েছে প্রচলিত ধারণা মতে 'হুর' বলতে বেহেশতবাসীর জন্য নির্ধারিত সুন্দরী রমণীকে বুঝানো হয়েছে। তারপর বলা হয়েছে- আল্লাহপ্রাপ্ত সাধকগণ বলেন 'হুর' বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফসকে বুঝায়। এভাবে ঈমান আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে করা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল। যেমন-

* **জান্নাত সম্পর্কে বলা হয়েছে-** "প্রভূর সাথে পুনরায় মিলনে আত্মার যে প্রশান্তি ও আনন্দ লাভ হয় উহাই শ্রেষ্ঠ সুখ। এ মহামিলনের নামই প্রকৃত জান্নাত।"[৯৭] এখানে জান্নাতের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং জান্নাত বলতে আত্মিক সুখকে বোঝানো হয়েছে।

---

[৯৬] প্রচলিত ধারনা তাদের মতে প্রকৃত ধারণা নয়, অর্থাৎ এটা ভুল। এ কথা 'আল্লাহ কোন পথে?' গ্রন্থের ভূমিকায় বলা হয়েছে।

[৯৭] "আল্লাহ কোন পথে"? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৪০।

* **জান্নাতের হুর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** হুর বলতে মানুষের জীবাত্মা বা নফসকে বুঝায়।[৯৮]

* **জাহান্নাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** "আত্মার চিরস্থায়ী যন্ত্রণাদায়ক অবস্থাকেই জাহান্নাম বলে।"[৯৯] এখানে জাহান্নামের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে এবং আত্মার যন্ত্রণাকে জাহান্নাম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

* **হাশর বা পুনরুত্থান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** "সূফী সাধকগণের দৃষ্টিতে মানুষের হাশর পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হয়ে থাকে। মানুষকে তার কর্মের প্রতিফল সঙ্গে সঙ্গেই প্রদান করা হয়।"[১০০] এখানে মৃত্যুর পর স্বশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করা হয়েছে।

উক্ত গ্রন্থে অত্যন্ত পরিস্কার ভাষায় মৃত্যুর পর স্বশরীরে পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে বলা হয়েছে ঃ "প্রকৃতপক্ষে (মৃত্যুর পর) মৃত ব্যক্তির দেহের কোন ক্রিয়া থাকে না, তার আত্মার উপরেই সবকিছু হয়ে থাকে। আর এ আত্মাকে পরিত্যক্ত দেহে আর কখনো প্রবেশ করানো হয় না।[১০১]

* **পুলসিরাত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** "পুলসিরাত পার হওয়া বলতে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর কায়েম থাকা এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করাকে বুঝায়।"[১০২]

* **মীযান সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** "মীযান বলতে মানুষের ষড়রিপুমুক্ত পরিশুদ্ধ বিবেককে বুঝায়।"[১০৩]

* **মুনকার-নাকীর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** "মুনকার ও নাকীর বলতে কোন ব্যক্তির ভাল ও মন্দ কর্মবিবরণীকে বুঝায়।"[১০৪]

* **কিরামান কাতেবীন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** পরমাত্মার বিদ্যমান সূক্ষ্ম শক্তি যা ফেরেশতার ন্যায় ক্রিয়াশীল উহাই আলাদা আলাদা ভাবে পাপ এবং পূণ্যের বিবরণী লিপিবদ্ধ করে অর্থাৎ, তা পরমাত্মার স্মৃতিফলকে সংরক্ষিত হয়।[১০৫]

---

[৯৮] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১২।
[৯৯] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৪।
[১০০] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৪।
[১০১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৯।
[১০২] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬০।
[১০৩] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৫৭।
[১০৪] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৯।

www.waytojannah.com

* **আমলনামা ঃ** সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ আমলনামা বলতে মানুষের সৎ কর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতি এবং অপকর্মের দ্বারা আত্মার অবনতিকে বুঝায়।[১০৬]

* **ফেরেশতা সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** ফেরেশতা আলমে আমর বা সূক্ষ্মতিসূক্ষ্ম জগতের বস্তু, এবং ষড়রিপুমুক্ত পুতঃপবিত্র আত্মা বিশেষ। মানুষের মাঝে ২টি আত্মা রয়েছে। একটি জীবাত্মা এবং অপরটি পরমাত্মা। পরমাত্মার ২টি অংশ। যথা- মানবাত্মা ও ফেরেশতার আত্মা। এই ফেরেশতার আত্মাই মানুষের দেহের ভিতরে ফেরেশতার কাজ করে থাকে।[১০৭]

* **দেওয়াবাগীর বিশ্বাস হল আল্লাহ ও জিব্রাঈল এক ও অভিন্ন ঃ** "আত্মার বাণী" (৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা) পত্রিকায় আছে।[১০৮] সুলতানিয়া মুজাদ্দেদিয়া তরীকার ইমাম চন্দ্রপুরী ফরমানঃ জিব্রাঈল বলতে অন্য কেহ নন স্বয়ং হাকীকতে আল্লাহ। উল্লেখ্য- এ পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি হলে মাহবূবে খোদা দেওয়ানবাগী স্বয়ং নিজে।

* **তাকদীর সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ** তাকদীর বলতে মানুষের কর্মফলকে বুঝায়। অর্থাৎ, মানুষের কর্মের দ্বারা অর্জিত উন্নতি অবনতির সংরক্ষিত হিসাব-নিকাশকে বুঝায়। সৃষ্টির আদি হতে অদ্যাবধি এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানুষের আত্মা বিভিন্ন বাহনে আরোহন পূর্বক কর্মের যে স্মরণীয় স্মৃতিশক্তি আত্মার মধ্যে সংরক্ষিত হয়েছে উহাকেই মূলত ঃ তাকদীর বলে।[১০৯]

এভাবে ঈমান-আকীদার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়ের ক্ষেত্রে এমন ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে যা উক্ত বিষয়গুলোকে অস্বীকার করার নামান্তর। অথচ এ বিষয়গুলো জরূরিয়াতে দ্বীন[১১০] -এর অন্তর্ভূক্ত। আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট এর যে, প্রতিষ্ঠিত ও চিরন্তন অর্থ এবং ব্যাখ্যা তার উপর সকলের ইজমা বা ঐক্যমত রয়েছে। আর এ ধরণের জরূরিয়াতে দ্বীনকে অস্বীকার করা কুফরী। আল্লামা সুবকী (রহঃ) তার *جمع الجوامع* গ্রন্থে লিখেছেন ঃ

---

[১০৫] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৬৮।
[১০৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১২৮।
[১০৭] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১০৩।
[১০৮] বাতিল পীরের পরিচয়, মুফতী মুহাম্মদ শামছুল হক, পৃঃ ২২॥
[১০৯] 'আল্লাহ কোন পথে? ৩য় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৩০॥
[১১০] এটা একটি পরিভাষা, এর অর্থ হল তা এমন বিষয় যা সকলের কাছে সুবিদিত, আম খাস নির্বিশেষে সকলেই সে সম্বন্ধে "অবগত ॥

جاحد المجع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر مطقا-

অর্থৎ, জরূরিয়াতে দ্বীন- যার উপর ইজমা সংঘটিত আছে- তার অস্বীকারকারী এক বাক্যে কাফের।

তবে এ ধরণের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে, প্রথমত ঃ যদি তারা কোন ব্যাখ্যা ছাড়াই বেধড়ক কুরআন হাদীছের ভাষ্যকে অস্বীকারপূর্বক মনগড়া মতামত ব্যক্ত করে। কিংবা শরঈ হুকুমের মাঝে যে ব্যাখ্যামূলক মতামত (*تاويل*) তারা দেয়, তা (*تاويل*)-এর নিয়ম নীতি অনুসরণ করে দেয় না, তাহলে তারা যে ব্যাখ্যা (*تاويل*)-এর আলোকে নিজেদের ধ্যান-ধারনা পোষণ করেছে তা শরীয়'আতের নীতি মাফিক না হওয়াতে তারা কুফ্‌রীতে লিপ্ত হয়ে পড়বে।

হযরত মাওলানা ইদ্রীছ কান্দেহলভী লিখেছেন- কোন জরূরিয়াতে দ্বীনের যদি এমন ব্যাখ্যা দেয়া হয় যা তার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত অর্থের বিপরীত, তাহলে এটা সে বিষয়কে অস্বীকার করারই নামান্তর।[১১১]

উপরোক্ত ঈমান-আকীদা সংক্রান্ত বিষয়াদির বাইরে আমলগত বিভিন্ন বিষয়েও তিনি মারাত্মক বিভ্রান্তিকর ও গোমরাহীমূলক ধ্যান-ধারনা পোষণ করেন। যেমন ঃ

১. দেওয়ানবাগী পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। পূর্বে চন্দ্রপাড়া পীরের আকীদা বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে তিনি পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা ছিলেন। চন্দ্রপাড়ার পীর পুনর্জন্মবাদের প্রবক্তা। মাসিক আত্মার বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ২৬ সংখ্যা পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে ঃ চন্দ্রপুরী ফরমাইলেন পুনর্জন্ম সম্বন্ধে কুরআনেই আছে-

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ-

অর্থাৎ কিভাবে তোমরা আল্লাহর সাথে কুফ্‌রী কর? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় তোমাদেরকে জীবন দান করবেন, অনন্তর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে। [সূরা বাকারা ঃ ২৮]

---

[১১১] *عقائد الاسلام*

www.waytojannah.com

চন্দ্রপুরীর মতে এখানে ثم يحييكم -এর অর্থ পৃথিবীতে পুনরায় জন্মলাভ করা। উল্লেখ্য দেওয়ানবাগী উক্ত পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি এবং চন্দ্রপাড়ার পীর তার পীর ও শশুর। সূতরাং বুঝ যায় দেওয়ানবাগীর আকীদাও অনুরূপ। 'আল্লাহ কোন পথে' গ্রন্থেও পুনর্জন্মবাদের স্বপক্ষে বর্ণনা দেখতে পাওয়া যায়।

খন্ডন ঃ

জমহুরের মতে এখানে ثم يحييكم -এর অর্থ হাশরে পুনরায় জীবিত অবস্থায় উত্থিত হওয়া। আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাস করা কুফরী।[১১২]

২. তিনি নিজে হজ্জ করেননি। এ বিষয়ে তার আল্লাহ কোন পথে? গ্রন্থে লেখা হয়েছে ঃ তার জনৈক ভক্ত আহমদ উল্লাহ দেওয়ানবাগী সাহেব কেন হজ্জ করেননি- এটা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে যান। স্বপ্নে দেখেন হযরত ইব্রাহীম (আ.) নির্মিত মক্কার কা'বা ঘর এবং স্বয়ং রাসূল (সা.) বাবে রহমতে হাজির হয়েছেন। রাসূল (সা.) তাকে উদ্দেশ্যে করে বলেছেন- আমি স্বয়ং আল্লাহর নবী মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর সাথে আছি এবং সর্বক্ষণ থাকি। আর ক্বা'বা ঘরও তাঁর সম্মুখে উপস্থিত আছে আমার মুহাম্মাদী ইসলাম শাহ দেওয়ানবাগী প্রচার করতেছেন। তাঁর হজ্জ করার কোন প্রয়োজন নেই।"[১১৩]

এখানে মক্কাস্থিত বাইতুল্লাহ শরীফে গিয়ে হজ্জ পালন করার ফরযিয়াতকে অস্বীকার করা হয়েছে। আর হজ্জ হল ইসলামের পঞ্চ বুনিয়াদের একটি। এটাকে অস্বীকার করা সন্দেহাতীতভাবে কুফ্রী।

এসব কুফ্রী আকীদা-বিশ্বাস ছাড়াও তিনি কুরআন- হাদীছের বহু বক্তব্যকে চরম ভাবে বিকৃত করেছেন। যেমন কুরআনে বর্ণিত হযরত আদম ও হাওয়া কর্তৃক নিষিদ্ধ ফল খাওয়া সম্বন্ধে তার বক্তব্য হল ঃ এই ফল দ্বারা যদি গন্দম ফল ধরা হয়, তাহলে অর্থ হবে গমের আকৃতির ন্যায় নারীদের গোপন অঙ্গ এবং আঞ্জির ফল ধরা হলে তার অর্থ হবে সদ্য যৌবনপ্রাপ্তা নারীর বক্ষযুগল। অতএব আদম হাওয়ার নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ অর্থ তাদের যৌন মিলন।[১১৪]

---

[১১২] كشاف اصطلاحات الفنون

[১১৩] আল্লাহ কোন্ পথে? দ্বিতীয় সংস্করণ, মে/১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৯২-১৯৩। উল্লেখ্য অত্র বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে নিরবে এ বিষয়টির উল্লেখ পরিত্যাগ করা হয়েছে ॥

[১১৪] আল্লাহ কোন্ পথে? ৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দ, পৃঃ ৯৮ ॥

www.waytojannah.com

জমহুরে উম্মতের নিকট গৃহীত পরিস্কার ব্যাখ্যার বিপরীত এরূপ ব্যাখ্যা প্রদানকারীদের বলা হয় যিন্দীক ও মুলহিদ।

উপরোল্লেখিত বিষয় ছাড়াও বিভিন্ন আকাইদগত বিষয় ও বিভিন্ন মাসায়েলের ক্ষেত্রে তিনি জমহুরের মতামতের বিপরীত এবং অদ্ভুত ধরণের কিছু বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন ঃ

১. আল্লাহ ও রাসূলকে স্বচক্ষে না দেখে কালিমা পড়ে সাক্ষ্য দেয়ার ও বিশ্বাস করার কোন অর্থ হয় না।

২. কুরআন, কিতাব, হাদীছ, তাফসীর পড়ে আল্লাহকে পাওয়া যায় না। একমাত্র মুরশিদের সাহায্য নিয়ে আধ্যাত্মিক সাধনা করেই আল্লাহকে পাওয়া সম্ভব, এমনকি দুনিয়াতেই স্বচক্ষে দেখা যায়। (নাউবিল্লাহ)

৩. আল্লাহর সাথে যোগাযোগ সবই ক্বালবেই (অন্তরে) হয়ে থাকে। অন্যভাবে হাজার ইবাদত করেও আল্লাহকে পাওয়া যায় না।

৪. সাধনার দ্বারা আল্লাহকে নিজের ভিতরেই খুঁজে পাওয়া সম্ভব, বাইরে কোথাও নয়। কঠিন সাধনার মাধ্যমে আমিত্বকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সাধকের সাথে আল্লাহ্ এমনভাবে মিশে যান, যেমন চিনি দুধের সাথে মিশে একাকার হয়ে যায়। তখন ঐ বান্দাকে আল্লাহ থেকে আলাদা করা মুশকিল।

৫. এরূপ ধ্যান করবেন, আদমের জীরে কদম (পায়ের নীচে) ক্বালব। এই ক্বালবে আল্লাহ ও রাসূল থাকেন।

৬. কোরআনে আল্লাহ আমাদেরকে এই ধারণা দিচ্ছেন যে, তিনি আমাদের ভিতরে এবং অতি নিকটে অবস্থান করেন কিন্তু আমরা এতই মূর্খ যে, তাঁর অবস্থান সাত আসমানের উপর বলে মনে করে থাকি।

৭. গত ১৯৯৮ সালে বিশ্ব আশেকে রাসূল সম্মেলনে আল্লাহ ও রাসূল স্বয়ং দেওয়ানবাগে এসেছিলেন। আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিলেন উক্ত সম্মেলনে উপস্থিত সমস্ত আশেকদের তালিকা তৈরী করতে। ঐ তালিকাভূক্ত সবাই বেহেশতে চলে যাবে।[১১৫]

---

[১১৫] সূত্র ঃ মাসিক আত্মার বাণী, সংখ্যা- নভেম্বর- ৯৯, পৃঃ ১০।

৮. সূর্যোদয় পর্যন্ত সেহরী খাওয়ার সময়। সুবহে সাদেক অর্থ প্রভাত কাল। হুজুরেরা ঘুমানোর জন্য তাড়াতাড়ি আযান দিয়ে দেয়। আপনি কিন্তু খাবার বন্ধ করবেন না। আযান দিয়েছে নামাযের জন্য। খাবার বন্ধের জন্য আযান দেয়া হয় না।[১১৬]

৯. দেওয়ানবাগী ও তার অনুসারীগণ প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠানের উপর অত্যন্ত জোর প্রদান করে থাকেন। তাদের শ্লোগান হল "ঘরে ঘরে মীলাদ দাও রাসূলের শাফাআত নাও।"

এ ধরণের যিন্দীক ও মুলহিদ সূলভ এবং কুফরী আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা সত্ত্বেও দেওয়ানবাগী সাহেবের দাবী হল ঃ

১. তিনি আসল ইসলামের প্রচারক। তিনি তার প্রচারিত উপরোক্ত ধ্যান-ধারনা সম্বলিত মতবাদের নাম দিয়েছেন মোহাম্মাদী ইসলাম।[১১৭] তার বক্তব্য হল- তার মতবাদের বাইরে সারা বিশ্বে যে ইসলাম চালু রয়েছে এটা আসল ইসলাম নয়, এজিদী ইসলাম, এজিদী চক্রান্তের ফসল।

২. আল্লাহই তাকে গোটা বিশ্বে খাঁটি মোহাম্মাদী ইসলাম প্রচারের দায়িত্ব দিয়ে নূরে মোহাম্মাদীর ধারক ও বাহক রূপে পাঠিয়েছেন। তার সাপ্তাহিক পত্রিকায় লেখা হয়েছে- আল্লাহ ও রাসূল (সা.)সহ সমগ্র রূপে নবী রাসূল, ফেরেশতা এবং দেওয়ানবাগী ও তার মোর্শেদ চন্দ্রপাড়ার মৃত আবুল ফজলের উপস্থিতিতে সমস্ত ওলী আউলিয়াগণ এক বিশাল ময়দানে সমবেত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে দেওয়ানবাগীকে মোহাম্মাদী ইসলাম-এর প্রচারক নির্বাচিত করেন। অতঃপর সবাইকে নিয়ে আল্লাহ এক বিশাল মিছিল বের করেন। আল্লাহ, রাসূল দেওয়ানবাগী ও তার পীর- এর ৪ জনের হাতে মোহাম্মাদী ইসলামের পতাকা। আল্লাহ, দেওয়ানবাগী ও তার পীর- এই ৩ জন সমানের সারিতে। সমস্ত নবী রাসূলসহ বাকীরা পেছনে। মিছিলে আল্লাহ নিজেই শ্লোগান দিচ্ছিলেন- মোহাম্মাদী ইসলামের আলো ঘরে ঘরে জ্বালো।[১১৮]

---

[১১৬] সূত্র ঃ মাসিক আত্মার বাণী; সংখ্যা- নভেম্বর- ৯৯, পৃঃ ৯ ॥

[১১৭] তার প্রায় প্রত্যেকটা বইয়ের প্রচ্ছদ মোহাম্মদী ইসলাম লেখা আছে এবং এই ইসলামের বিশেষ পতাকা দেখানো হয়েছে।

[১১৮] সাপ্তাহিক দেওয়ানবাগ পত্রিকা, সংখ্যা- ১২/৩/৯৯ শুক্রবার ॥

www.waytojannah.com

৪. তিনি বর্তমান যামানার মোজাদ্দেদ, মহান সংস্কারক, শ্রেষ্ঠতম ওলী- আল্লাহ্।[১১৯]

তার সম্পর্কে উপরোক্ত দাবী ও তার বুযুর্গী প্রমাণে তার ও তার ভক্তদের বিভিন্ন স্বপ্নের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন ঃ তিনি খাবে দেখেছেন যে, ঢাকা ও ফরিদপুরের মধ্যখানে একটি বাগানে নবীজির প্রাণহীন দেহ খালি গায়ে পড়ে আছে। অতঃপর দেওয়ানবাগীর হাতের স্পর্শে নবীজি তাকে বলেছেন- হে ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী! সবশেষে নবীজি দেওয়ানবাগীর সাথে হেঁটে হেঁটে চলে এসেছেন।[১২০]

আরও স্বপ্ন বর্ণনা করা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) স্বপ্নযোগে তাকে "ইসলাম ধর্মের পুনর্জীবনদানকারী" খেতাবে ভূষিত করেছেন।[১২১]

এভাবে তার সূফী ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত বইগুলির বিভিন্ন স্থানে তার নিজের এবং তার ভক্তবৃন্দের বিভিন্ন স্বপ্ন বর্ণিত হয়েছে যা দ্বারা তার বুযুর্গী প্রমাণ করার প্রয়াস নেয়া হয়েছে। অথচ স্বপ্ন কোন দলীল নয়। কাযী ইয়ায বলেন ঃ স্বপ্নের দ্বারা কোন নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। আল্লামা নববী বলেন- তদ্রুপ স্বপ্নের দ্বারা কোন হুকুমের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এ ব্যাপারে ইত্তেফাক বা সর্বসম্মত মত রয়েছে। যদিও হাদীছে বলা হয়েছে-

من رانى فى المنام فقد ر اى الحق-

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) বলেন যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে যেন আমাকেও দেখল। কেনা শয়তান আমার রূপ ধারন করতে পারে।

এ হাদীসে বুঝানো হয়েছে যে, রাসূল (সা.) কে স্বপ্নে দেখা মিথ্যা হতে পারে না। কেননা শয়তান রাসূল (সা.)-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে স্বপ্নে সে যা শুনেছে তা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে এবং তা সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই স্বপ্ন কোন দলীল হতে পারে না। এ ব্যাপারে আল্লামা নববী তার দীর্ঘ ইবরতে যা বলেছেন, সংক্ষিপ্ত ভাবে তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল ঃ

---

[১১৯] আল্লাহ কোন পথে? গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা, ১৩৭ পৃষ্ঠা, 'রাসূল সত্যিই কি গরীব ছিলেন ? পৃষ্ঠা নং- ১২ (ভূমিকা) ॥

[১২০] তথ্যসূত্র ঃ 'রাসূল সত্যিই কি গরীব ছিলেন? পৃষ্ঠা- ১২ (ভূমিকা), চতুর্থ সংস্করণ, সেপ্টেম্বর, ২০০১ ॥

[১২১] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ১১ ॥

www.waytojannah.com

قال القاضى عياض:.....لايقطع بامر المنام ولا انه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت وهذا باجماع العلماء هذا كلام القاضى وكذا قاله غيره من اصحابه وغيرهم فنقلوا الاتفاق على انه لايغير به بسبب ما براه النائم ما تقرر فى الشرع-

কিছু লোক হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা.) কর্তৃক স্বপ্নে আযানের শব্দগুলো শুনেছিলেন এবং রাসূল (সা.) সে অনুযায়ী আযান প্রবর্তন করেছিলেন- এ দ্বারা স্বপ্ন দলীল বলে প্রমাণ পেশ করে থাকেন। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা সেখানে স্বপ্নটি সঠিক বলে রাসূল (সা.) স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ

ان هذه لرؤيا حق- (ترمذى جـ/١)

অর্থাৎ এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন।

রাসূল (সা.) এরূপ স্বীকৃতি না দিলে শুধু ঐ সাহাবীর স্বপ্নের ভিত্তিতে আযান প্রচলিত হত না। আর রাসূল (সা.)-এর ইন্তেকালের পর কারও স্বপ্ন সত্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার যেহেতু কেই থাকেনি, তাই এখন কারও স্বপ্নকে দলীল হিসেবে দাঁড় করানো যাবে না। এখানে এ কথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, রেওয়াতে দ্বারা প্রমাণিত আছে- হযরত ওমর (রা.) এর ২০ দিন পূর্বে আযানের এরূপ শব্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি সে স্বপ্নের ভিত্তিতে সেভাবে আযান দেয়া শুরু করেননি।

স্বপ্ন দ্বারা কোন কিছুর দলীল দাঁড় করানো যায় না। বুযুর্গী স্বপ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় না; বুযুর্গী প্রমাণিত হয় সহীহ-ঈমান-আকীদা ও সহীহ আমল দ্বারা। অতএব, যতই স্বপ্ন বর্ণনা করা হোক দেওয়ানবাগীর ন্যায় যিন্দীক, মুলহিদ ও কুফ্‌রী পোষণকারী ব্যক্তি (এসব আকীদা পরিত্যাগ করা ব্যতীত) কস্মিনকালেও বুযুর্গ হতে পারে না।

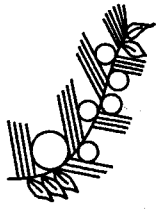

রাজারবাগী

(রাজারবাগ পীর দিলুর রহমান ও তার চিন্তাধারা)

রাজারবাগী পীরের নাম দিলুর রহমান। ৫নং আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা- ১২১৭ মুহাম্মাদীয়া জামিয়া শরীফ ও সুন্নাতী জামে মসজিদ তার দরবার। তিনি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানাধীন প্রভাকরদী গ্রামের তাঁতী ও সূতা ব্যবসায়ী মরহুম জনাব মোখলেছুর রহমান মিঞার ৩য় পুত্র। তিনি নিয়মতান্ত্রিক লেখাপড়া করা কোন আলেম নন, একজন কলেজ শিক্ষিত ব্যক্তি। তবে তিনি দাবী করেন, যে তাকে ইলমে লাদুন্নী দান করা হয়েছে তিনি "বাহরুল উলূম" বা জ্ঞানের সমুদ্র। তার দাবী হল তিনি সাধারণ পীর নন বরং গাউছুল আজম এবং আমীরুল মু'মিনীন ফিত তাসাউফ অর্থাৎ তাসাউফ শাস্ত্রেও সর্বোচ্চ নেতা। তার মুরীদগণের বর্ণনা মতে বড়পীর আব্দুল কাদের জিলানীর চেয়েও তার মাকাম অনেক উর্ধ্বে।[১২২] তিনি কোন পীর থেকে খেলাফত লাভ করেননি। তবে তিনি বলেন স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূল (সা.) তাকে খেলাফত দান করেছেন।

তিনি নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য ৩ ধরনের পন্থা গ্রহণ করেছেন।

১. নিজের নামের আগে পিছে প্রায় ৫২টি উচ্চ অর্থ সম্পন্ন খেতাব সংযুক্ত করেছেন। আজ পর্যন্ত উম্মতের কেউ এমন খেতাবের বিশাল বহর নিজের নামের সাথে যোগ করেননি।[১২৩] তিনি বলেন এর অনেকগুলো খেতাব তাকে দিয়েছেন তরীকতের ইমাম বা পীর আউলিয়াগণ।[১২৪] তার খেতাবের মধ্যে

---

[১২২] মাসিক আল মাইয়্যিনাত, ৭৩ তম সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৬-এ লেখা হয়েছে ঃ উল্লেখ্য রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দজিল্লুহুল আলী-এর নামের পূর্বে যেসব লক্বব রয়েছে, উনি তারও উর্ধ্বে। এমনকি কথিত গাউছুল আযম লক্বেরও উর্ধ্বে।

[১২৩] মাসিক আল মাইয়্যিনাত, ও আঞ্জুমানে আল-বাইয়্যিনাত এর পক্ষ থেকে এর জবাবে একাধিক প্রচার পত্র ছাপা হয়েছে। যার মধ্যে বলা হয়েছে। "মাওলানা আশরাফ আলী থানবী সাহেবের লক্বব ছিল প্রায় ৬১টি। এমনিভাবে ইমাম আবু হানিফার ৪৮টি, বড়পীর আব্দুল কাদের জ্বিলানী সাহেবের লকব ৫১টি. ইমাম বুখারীর ২৮টি ইত্যাদি। কিন্তু রাজারবাগী সাহেব সম্ভবতঃ ইচ্ছাকৃতভাবেই এ বিষয়টি চেপে গেছেন যে, এসব লকব তাদের নিজেদের দেয়া নয়। বিভিন্ন জন তাদের প্রশংসায় যেসব শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন, তা গণনা করলে হয়তবা এরকম সংখ্যা দেখানো যাবে, কিন্তু তারা নিজেরা কখনও আত্মপ্রচারের জন্য এসব খেতাব চয়ন করে করে নিজেদের নামের সাথে জুড়ে দেননি। তদুপরি তারা রাজারবাগী সাহেবের ন্যায় নামের আগে পিছে এরকম খেতাবের বহন জুড়ে দেয়াকে সুন্নাত মনে করেননি। বরং পূর্বসূরীদের অনেকে এটা অপছন্দ করতেন, তার বহু প্রমান রয়েছে। অতএব এসব জারিজুরি করে জনগণকে ধোকা দেয়া ঠিক হবে না।

[১২৪] তথ্যসূত্র ঃ দিলুর রহমান সাহেবের বয়ানের ক্যাসেট। এ ক্যাসেট আমার (লেখকের) কাছে সংরক্ষিত আছে॥

www.waytojannah.com

রয়েছে- মুফতিয়ুল আজম, বাহরুল উলূম ওয়াল হিকাম, হাফিজুল হাদীছ, হাকিমুল হাদীছ, হুজ্জাতুল ইসলাম ফিল আলামীন তাজুল মুফাস্‌সিরীন, রঈসুল মুহাদ্দিছীন, আমীরুল মু'মিনীন ফী উলুমিল ফিকহে ওয়াত তাসাওউফ, মাখযানুল মা'রেফাত, ইমামুস সিদ্দীকীন, গাউছুল আজম, কুতবুল আলম, সাইয়্যিদুল আউলিয়া, আফজালুল আউলিয়া, সুলতানুল আরিফীন, শাইখুশ শুয়ুখ ওাল মাশায়েখ, মুজাদ্দিদ ফিদদীন, সাইয়্যিদীন মুজতাহিদীন, কাইউমুয যামান, হাবীবুল্লাহ প্রভৃতি।[১২৫]

খন্ডন ঃ

(এক)ঃ তিনার স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ কর্তৃক, রাসূল (সা.) কর্তৃক ও আউলিয়াগণ কর্তৃক এসব খেতাব লাভ করেছেন বলে দাবী করেন, অথচ স্বপ্ন শরীআতে হুজ্জাত বা দলীল নয়। যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। স্বপ্ন দলীল হওয়ার ব্যাপারে কিছু লোক যে প্রমাণ পেশ করে থাকে পূর্বের পরিচ্ছেদে তার খণ্ডনও পেশ করা হয়েছে।

(দুই)ঃ তদুপরি তার ব্যবহৃত এসব খেতবের মধ্যে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা বহির্ভূত অনেক দাবীও এসে গেছে। যেমন ঃ "ইমামুস সিদ্দীকীন" বা সিদ্দীকগণের ইমাম। এই সিদ্দীকীনদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)ও, যার মর্যাদা উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উর্ধ্বে। এ ব্যাপারে আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের কারও কোন বিরোধ নেই। অথচ তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে দাবী করলেন তিনি "ইমামুস সিদ্দীকীন" বা সিদ্দীকগণের ইমাম। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের মতে সাহাবী নন এমন কোন ব্যক্তি কখনও সাহাবীর মর্যদায় উপনীত হতে পারেন না।[১২৬] কিন্তু দিল্লু সাহেব এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেন। যেমন- তার আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকায় লেখা হয়েছে- হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) বলেছেন- "আমি উরূয করতে করতে সিদ্দীকে আকবার হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-এর মাকাম অতিক্রম করলাম। (নাউযুবিল্লাহ!) এরপর পত্রিকাটিতে মন্তব্য করা হয়েছে যে, দৃশ্যতঃ এখানেও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ)-এর চেয়ে তার মর্যাদা বেশী প্রকাশ পায়।[১২৭]

---

[১২৫] তথ্যসূত্র ঃ তাদের প্রচারিত বিভিন্ন মাহফিলের হ্যান্ডবিল ও আল-বায়্যিনাত পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা ॥

[১২৬] সাহাবীদের সম্বন্ধে আকীদা" শিরোনামে প্রথম খণ্ডে এ সম্পর্কে আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥

[১২৭] আল্লামানে আল-বাইয়্যিনাত এর পক্ষ থেকে এ জবাবে প্রচারিত একটি পত্রে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক হযরত মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, তার ছেলে হযরত ইমাম মাছুম, তার ছেলে হুজ্জাতুল্লাহ নকশবন্দ, তার ছেলে আবুল উলা প্রমুখকে 'কাইউম' লকব দিয়েছিলেন।

www.waytojannah.com

মন্তব্য ঃ

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.) এমন কথা বলেছিলেন কি না তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। বস্তুতঃ এ সব বুযুর্গদের সম্পর্কে অতি ভক্তদের দ্বারা এমন অনেক কিছু রটানো হয়েছে যা সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না, তবে এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করার দ্বারা রাজারবাগী সাহেবের আকীদা যে এরূপ তা অবশ্যই প্রমাণিত হয়েছে।

(তিন)ঃ তার খেতাবের মধ্যে জঘন্য বেয়াদবীসূচক খেতাবও রয়েছে। যেমন- তিনি "হাবিবুল্লাহ" খেতাব ব্যবহার করেছেন। অথচ হাবীবুল্লাহ বলতে একমাত্র রাসূল (সা.) কেই সকলে বুঝে থাকেন। এখন নিজের জন্য এই খেতাব ব্যবহারকে হয় জঘন্য বেয়াদবী বলতে হবে নতুবা বলতে হবে তিনি রাসূল (রা.)-এর সমান মাকাম বা মর্যাদার দাবী করছেন, যা হবে কুফরীর পর্যায়ভূক্ত। নাউবিল্লাহি মিন যালিক।

(চার)ঃ তার খেতাবসমূহের মধ্যে কুফরী জ্ঞাপক খেতাবও রয়েছে। যেমন "কাইউমুয্ যামান" খেতাবটি। কাইউম শব্দটি আল্লাহ তা'আলার একটি ছিফাতী নাম, যার অর্থ জগতের ধারক ও রক্ষক। অতএব, কাইউমুয যামান অর্থ হবে যামানার ধারক ও রক্ষক। এ কথাটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, অন্য কারও ব্যাপারে নয়। কোন মাখলূক কাইউম হতে পারে না বরং আব্দুল কাইউম বা কাইউমের গোলাম হতে পারে। কোন মানুষের হাতে

এখানে 'কাইউমুয যামান' কথাটার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে অর্থ করতে হবে ইত্যাদি। এখানেও রাজারবাগী সাহেব প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। তারা এই খেতাব ব্যবহার করে থাকলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রূপক অর্থেই ব্যবহার করে থাকবেন। কিন্তু রাজারবাগী সাহেব ও তার অনুসারীগণতো প্রকৃত অর্থেই ব্যবহার করছেন। তার প্রমাণ হল তা পত্রিকায় গাওছুল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ গাওসুল আযম, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, মুহিউদ্দিন, বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) বলেছেন, "কোন চাঁদ উদিত হয় না, কোন সূর্য অস্ত যায় না আমার অনুমতি ব্যতীত। (নাউবিল্লাহ!) অতঃপর একটু সামনে গিয়ে রাজারবাগী সাহেবও এরূপ ক্ষমতা রাখেন সেদিকে ইংগিত করে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে ঃ উল্লেখ্য, এ ধরনের আখাসসুল খাছ মর্যাদা-মর্তবার ওলী আল্লাহর ধারাবাহিকতায় বর্তমানে সমাসীন ইমামুল আইম্মা, কুতবুল আলম, মুজাদ্দিদে যামান, আওলাদে রাসূল, ঢাকা রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দা জিল্লুহুল আলী। (আল-বাইয়্যিনাত, ৭১ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৯৯ পৃষ্ঠা ১৩৯) এভাবে বোঝানো হয়েছে যে, রাজারবাগী সাহেব সত্যিকার অর্থেই কাইউমুয যামান। তার হাতেও (নাউবিল্লাহ) জগত পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত।

www.waytojannah.com

(নাউযুবিল্লাহ) জগত পরিচালনার ক্ষমতা ন্যস্ত থাকতে পারে না। সুতরাং কোন মানুষের ব্যাপারে এ উপাধি ব্যবহার নিঃসন্দেহে কুফরী জ্ঞাপক।

এছাড়া তার উপাধিসমূহ যে অতিরঞ্জনে ভরা তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

২. দিলুর রহমান সাহেব নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য দ্বিতীয় যে পন্থা গ্রহণ করেছেন তা হল- তিনি তার নিজের মর্যাদার ব্যাপারে এবং তার মাসিক পত্রিকা "আল-বাইয়্যিনাত" এর মর্যাদা ও গুরুত্বের ব্যাপারে নিজের ও বিভিন্ন জনের স্বপ্ন বর্ণনা করে থাকেন। যেমন ঃ নিজের ব্যাপারে তিনি বলেন-

(১) তিনি স্বপ্ন দেখলেন একটি কাঁচের ঘর, যাতে কোন দরজা জানালা কিছুই ছিল না। সেই ঘর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ৪ জন ওলীকে বসানোর জন্য ৪ কোনে ৪ খানা আসন রাখা হল। সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ আউলিয়া ঐ ঘরের চারপাশে ঘুরাঘুরি করছিলেন। সবাই বলাবলি করছিলেন এই ৪টি আসনে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চারজন ওলীকে বসানো হবে। সকলে ভাবছেন কাকে বসানো হয়। এ অবস্থায় হযরত বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) ও হযরত মুজাদ্দেদে আলফে সানী (রহ.) একে একে ৩টি আসনে বসে পড়লেন। এবার লক্ষ লক্ষ আউলিয়ার মধ্যে বলাবলি হচ্ছিল যে, চতুর্থ আসনটিতে চার তরীকার চারজন ইমামের অবশিষ্ট মহামানব হযরত শায়েখ বাহাউদ্দীন নকশাবন্দী (রহ.) এসে বসবেন। কিন্তু দেখা গেল একজন ফেরেশতা এসে আমাকে (দিলু সাহেবকে) টেনে নিয়ে ঐ আসনে বসিয়ে দিলেন। এ চারজন ছাড়া আর কাউকেই ভিতরে ঢুকতে দেয়া হয়নি।[১২৮]

(২) তিনি বলেন তার এক মুরীদ ভাই তাকে বলেছেন তিনি রাসূল (সা.) কে স্বপ্নে দেখেছেন। তিনি নবীজি (সা.) কে চার তালিওয়ালা টুপি[১২৯] পরিহিত দেখে জিজ্ঞাসা করেছেন যে, হুজুর টুপি নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব চলছে, কোনটা আপনার খাস সুন্নাত? উত্তরে নবী (সা.) বলেছেনঃ টুপি, সুন্নাত, মাসলা-মাসায়েল যা কিছু জানতে হয় রাজারবাগের দিলুর কাছ থেকে জেনে নিও।

---

[১২৮] তথ্যসূত্র ঃ প্রাগুক্ত ক্যাসেট ॥

[১২৯] দিলুর রহমান সাহেবের মতে চারতালিওয়াল টুপি নবীজির খাস সুন্নাত ॥

খণ্ডন ঃ

এখানেও তিনি স্বপ্নের মাধ্যমে টুপি সম্পর্কে তার ধারণা ও তার বুযুর্গীর স্বপক্ষে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে স্বপ্ন কোন দলীল নয়। একমাত্র আম্বিয়ায়ে (আ.)-এর স্বপ্নই দলীল, অন্য কারও স্বপ্ন দলীল নয়। তবে কুরআন হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের অনুকূলে কোন স্বপ্ন হলে সেটাকে সহযোগিতা হিসেবে গ্রহণ করা যায়। এ ব্যাপারে পূর্বে "দেওয়ানবাগী" শিরোনামের অধীনে কিছু এবং অত্র খণ্ডের শুরুতে আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।[১৩০]

(৩) স্বপ্নে স্বয়ং নবীজি (সা.) নাকি তাকে বলেছেন তিনি আওলাদে রাসূল। এরপর থেকে তিনি নিজেকে আওলাদে রাসূল পরিচয় দিয়ে থাকেন।

খণ্ডন ঃ

স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী নিজেকে আওলাদে রাসূল বলে পরিচয় দেয়া যায় না। কেননা স্বপ্ন দলীল নয়। কেউ রাসূল (সা.) কে স্বপ্নে দেখলে সেটা সত্য, কেননা শয়তান রাসূল (সা.)- এর রূপ ধরতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে রাসূল (সা.) কে বলতে শুনেছে, সেটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছে, তার নিশ্চয়তা নেই হতে পারে তার মনের মধ্যে শয়তান কোন কথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন ঃ শরী'আতে প্রমাণ নেই- এমন কোন ব্যাপারে যদি কারও মনে হয় যে, স্বপ্নে রাসূল (সা.) এটাই বলেছিলেন, তা হলে সেই স্বপ্ন অনুযায়ী সে তা করতে পার বে না। স্বপ্ন যে দলীল নয়, এ সম্পর্কে অত্র খণ্ডের বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। দেখুন

তার মাসিক পত্রিকা "আল-বাইয়্যিনাত"- এর মর্যাদা ও গুরুত্ব করার ব্যাপারেও তিনি বিভিন্ন স্বপ্ন বর্ণনা করে থাকেন। যেমন তিনি বলেছেন-

(১) তিনি স্বপ্নে দেখেছেন ফুরফুরার হযরত মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীক (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা মাওলানা রুহুল আমীন (রহ.) এক মাহফিলে ওয়াজ করছিলেন। এক পর্যায়ে তিনি সমবেত জনতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন ঃ দেখ আমি আগে মাসিক বাইয়্যিনাত পড়তাম না। আমাকে সর্বপ্রথম এটা পড়তে

[১৩০] প্রাগুক্ত ক্যাসেট ॥

www.waytojannah.com

বললেন হাদীছের বিখ্যাত ইমাম আল্লামা দাইলামী (রহ.)। তার পর বললেন খাজা মুঈনুদ্দীন চিশ্‌তী (রহ.)। অতঃপর আমি এক বন্ধুসহ গেলাম মদীনায় প্রিয় নবীজি (সা.)- এর যিয়ারতে, নবীজিও আমাকে বললেন বাইয়্যিনাত পড়তে। এরপর থেকে আমি বাইয়্যিনাত পড়ে থাকি। তিনি আরও বললেন দেখ যারা বাইয়্যিনাত-এর বিরোধীতা করবে, তার হালাক, ধ্বংস হয়ে যাবে, তারা ঈমান হারা হয়ে মারা যাবে।

মাসিক আল-বাইয়্যিনাত সম্পর্কে তিনি এত বাড়াবাড়ি করেছেন যে, আল-বাইয়্যিনাত, জুলাই ১৯৯৯ সংখ্যার ১৪৩ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে- আল্লামা রুমী (রহ.)-এর মছনবী শরীফকে যেমন ফার্সী ভাষায় 'কোরআন শরীফ' বলা হয়, তদ্রুপ আল-বাইয়্যিনাতও যেন "বাংলা ভাষার কোরআন শরীফ"।

খন্ডন ঃ

(১) মৃত্যুর পর আম্বিয়ায়ে কেরাম কবরে নামায পড়েন বলে হাদীছে প্রমাণ রয়েছে। এ ছাড়া কবরে কোন ব্যক্তি পত্র পত্রিকাতো দূরের কথা কুরআন কিতাব পাঠ করে এমন কোন প্রমাণও কুরআন হাদীছের কোথাও নেই।

(২) একদিকে তিনি আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকাকে কুরআন বলে আখ্যায়িত করছেন, আর আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকার বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হয়ে যাওয়ার ধারনা প্রদান করছেন। এর অর্থ হল তিনি এই পত্রিকাকে প্রকৃত অর্থেই কুরআনের সমতুল্য আখ্যায়িত করতে চান। তাই এর বিরোধিতাকে ঈমান হারা হবে বৈ কি? মনে রাখা ভাল কুরআন নয় এমন কিছুকে যদি প্রকৃত অর্থেই কুরআনের সমতুল্য আখ্যায়িত করা হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে তা হবে কুফ্‌রী কথা। তিনি যদি এই পত্রিকাকে প্রকৃত অর্থেই কুরআনের সমতুল্য আখ্যায়িত করতে না চান তাহলে কারও লেখা একটা পত্রিকার বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হওয়ার প্রশ্নই অবান্তর। মছনবী-এর উদাহরণ টানা হল, একটা প্রতারণা মাত্র। নতুবা কেউ কখনও মছনবী শরীফকে প্রকৃত পক্ষেই কুরআন আখ্যায়িত করেননি এবং মছনবী শরীফের বিরোধিতা করলে ঈমান হারা হতে হবে এমন কথাও কেউ বলেননি।

(৩) রূপক অর্থেও আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকাকে কুরআন আখ্যায়িত করা কুরআনের সাথে জঘন্য ধরনের উপহাস। কেননা এই আল-বাইয়্যিনাত পত্রিকার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আলোচনায় না যেয়েও শুধু তার মধ্যে দিল্লু সাহেব ও তার চিন্ত ধারার প্রতিপক্ষকে যেসব অকথ্য গালিগালাজ লেখা হয়, তার সাথে কুরআনের

ভাষা ও বর্ণনাকে তুলনা করলে নিঃসন্দেহে কুরআনের সাথে উপহাস করা হবে। এমন একটি পত্রিকাকে কুরআন আখ্যায়িত করা কুরআনের অবমাননার শামিল।

আল-বায়্যিনাত পত্রিকায় উলামায়ে কেরাম সম্পর্কে এমন সব গালিগালাজ লেখা হয় যা কোন ভদ্রতা ও শালীনতার আওতায় পড়ে না। উক্ত পত্রিকায় শাইখুল হাদীস আজিজুল হক সাহেব, মাসিক মদীনার সম্পাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সাহেব, চরমোনাইয়ের পীর সাহেব, হাটহাজারী মাদরাসার মোহতামেম সাহেব প্রমুখ দেশ বরেণ্য সর্বজন শ্রদ্ধেয় নায়েবে রাসূলগণকে যেসব কুৎসিত গালি দেয়া হয়েছে, তার কয়েকটি নিম্নরূপ ঃ উম্মতে মোহাম্মাদী হতে খারিজ, মাওসেতুং ও গান্ধীর ভাবশিষ্য, শয়তানের পোষ্যপুত্র, মুশরিক, মুনাফেক, ধোকাবাজ, ভন্ড জাহেল, গোমরাহ, কাজ্জাব, কমীনা, জেনাখোর, নফসের পূজারী, মালউন ইত্যাদি।[১৩১]

খন্ডন ঃ

(১) গালিগালাজ করা ফাসেকী ও হারাম। হাদীসে বলা হয়েছে-

سباب المسلم فسوق-

অর্থাৎ, মুসলামানকে গালি দেয়া ফাসেকী

(২) কাউকে মুনাফিক আখ্যায়িত করা সম্ভব নয়। কেননা রাসূল (সা.)-এর ইন্তে কালের পর ওহীর দরজা বন্দ হয়ে যাওয়ার পর কারও অন্তরে মুনাফিকী আছে তা জানার পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। আর আমলী মুনাফিকীর ভিত্তিতে কাউকে মুনাফিক আখ্যায়িত করা জায়েয নয়।

(৩) কুরআনে কারীম আমাদেরকে বিরোধী প্রতিপক্ষের সমালোচনার ক্ষেত্রেও শালীনতার শিক্ষা দিয়েছে। অশালীন ভাষায় প্রতিপক্ষের সমালোচনা করা কুরআনের আদর্শ বিরোধী। কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ

অর্থৎ, আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে তারা আহ্বান করে, তোমরা তাদেরকে গালি দিওনা। তাহলে তারাও অজ্ঞানতাবশতঃ সীমালংঘন করে আল্লাহকে গালি দিবে। [সূরা আনআম ঃ ১০৮]

---

[১৩১] তথ্যসূত্র ঃ মাসিক আল বাইয়্যিনাত ঃ সংখ্যা- ৬৪, ডিসেম্বর ১৯৯৮; পৃষ্ঠা ৪০-৪২ ও ৪৪, সংখ্যা ৭০ জুন ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ৪৫ এবং রাজারবাগীর বয়ানের ক্যাসেট ॥

৩. দিলুর রহমান সাহেব নিজের বুযুর্গী প্রমাণ করার জন্য তৃতীয় যে পন্থা গ্রহণ করেছেন তা হলঃ তিনি বিভিন্ন বুযুর্গ সম্পর্কে অতি উচ্চ মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে কিছু প্রশংসা করেছেন তারপর বলেছেন যে, আমার মধ্যেও এসব বুযুর্গী রয়েছে। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

(১) 'কেউ যদি মুজাদ্দিদে আলফে সানী (রহ.)- এর লিখিত মাকতুবাত শরীফ পড়ে, (পড়াকালীন সময়ে) যদিও সে নবী নয়, তবুও নবীদের দফতরে তার নাম থাকে।" অতঃপর (দিলু সাহেব ও তার পত্রিকা বাইয়্যিনাত-এর অনুরূপ মার্যাদার প্রতি ইংগিত দিয়ে) বলা হয়েছে ঃ জ্ঞানীদের জন্য ইশারাই যথেষ্ট।[১৩২]

(২) রাজারবাগী সাহেব নিজেকে "গাওছুল আযম" দাবী করেছেন। আর তার পত্রিকায় গাওছুল আযম বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ গাওছুল আযম, সাইয়্যিদুল আওলিয়া, মুহিউদ্দীন, বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জীলানী (রহ.) বলেছেন, "কোন চাঁদ উদিত হয় না, কোন সূর্য অস্ত যায় না আমার অনুমতি ব্যতীত।" (নাউযুবিল্লাহ!) অতঃপর একটু সামনে গিয়ে রাজারবাগী সাহেবও এরূপ ক্ষমতা রাখেন সেদিকে ইংগিত করে পত্রিকাটিতে লেখা হয়েছে- "উল্লেখ্য, এ ধরনের আখাসসুল কাছ মর্যাদা-মর্তবার ওলী আল্লাহর ধারাবাহিকতায় বর্তমান সমাসীন ইমামুল আইম্মা, কুতুবুল আলম, মুজাদ্দিদে যামান, আওলাদে রাসূল, ঢাকা রাজারবাগ শরীফের হযরত পীর সাহেব ক্বিবলা মুদ্দা জিলুহুল আলী।"[১৩৩]

খণ্ডন ঃ

চাঁদ, সুর্য অস্ত যাওয়া, উদিত হওয়ার মত প্রাকৃতিক পরিচালনা (تصرفات علم) কোন মানুষের অনুমতি বা ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে কেউ বিশ্বাস করলে সে নিশ্চিত কাফের হয়ে যায়। বিশেষতঃ সূর্যের ব্যাপারে স্পষ্টতঃ হাদীছে এসেছে যে, সূর্য আল্লাহর আরশের নীচে সেজদায় পড়ে আল্লাহর কাছ থেকে অনুমতি প্রার্থনা করে অনুমতি লাভ হলে সে উদিত হয়। বোখারী শরীফে বর্ণিত উক্ত হাদীসটি নিম্নরূপ ঃ

عن ابى ذر قال قال النبى (ص) لابى ذر حين غربت الشمس اتدرى اين

---

[১৩২] বাইয়্যিনাত, ১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, জুন- ১৯৯২, পৃষ্ঠা ৪৬ ॥
[১৩৩] আল-বাইয়্যিনাত, ৭১ সংখ্যা, জুলাই, ১৯৯৯, পৃষ্ঠা ১৩৯ ॥

تذهب؟ قلت الله ورسوله اعلم قال فانها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها ويوشك ان تسجد فلا يقبل منها وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها ارجعى من حيث جئت فتطلع من مغربها فذالك قوله تعالى: والشمس تجرى لمستقرلها ذلك تقدير العزيز العليم-

হযরত আবদুল কাদের জীলানী (রহ.) উপরোক্ত কথা বলেছিলেন কি- না তা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়। আমরা পূর্বেও আলোচনা করেছি যে, বস্তুতঃ বুযুর্গদের সম্পর্কে অতি ভক্তদের দ্বারা এমন অনেক কিছু রটানো হয়েছে যা সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না,[১৩৪] তবে এ ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা দ্বারা রাজারবাগীরা যে এরূপ আকীদা বিশ্বাস রাখেন তা নিশ্চিতই প্রমাণিত হয়েছে। এটা নিঃসন্দেহে কুফরী আকীদা। কিছু শী'আদের ধারণা ছিল আল্লাহ তা'আলা জগত পরিচালনার দায়িত্ব হযরত আলী (রা.)-এর উপর ন্যাস্ত করেছেন। এভাবে তারা হযরত আলী (রা.) কে দ্বিতীয় খালেক (সৃষ্টিকর্তা) বানিয়ে রেখেছিল।[১৩৫] এ ধরনের গালী শী'আদেরকে উম্মত কাফের বলে আখ্যায়িত করেছেন।

উল্লেখ্য ঃ রাজারবাগীর পীর মুজতাহিদ হিসেবে জমহুরে উম্মতের খেলাফ অনেক মাসায়েলও উদ্ভাবন করেছেন। যেমন-

১. চার কুল্লী টুপি পরিধান করা নবীজির খাস সুন্নাত।

২. মুসলমানাদের উপর চরম ধরনের বিপদাপদ আসলে ফজরের নামাযে কুনুতে নাযিলা পাঠ করা জায়েয নয়, এরূপ কুনূতে নাযিলা পাঠ করা হলে নামায ফাসেদ হয়ে যায়।

৩. নামের শুরুতে বহু খেতাব ব্যবহার করা সুন্নাত।

৪. ১২ রবিউল আউয়াল মুসলমানদের জন্য বড় ঈদ। ইত্যাদি।

---

[১৩৪] হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) সম্পর্কে তার একটি জীবনী গ্রন্থে এমন ঘটনাও বর্ণিত আছে যে, একবার এক বৃদ্ধার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু ঘটায় বৃদ্ধা কাঁদছিলেন। অবশেষে বৃদ্ধার অনুরোধে আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) আযরাঈলকে সন্ধান করে বের করেন এবং বৃদ্ধার পুত্রের রূহকে ছেড়ে দিতে বলেন। আযরাঈল সেটা অস্বীকার করায় আব্দুল কাদের জিলানী আযরাঈলের হাত থেকে থলেটি ছিনিয়ে নিয়ে উপুড় করে দেন। ঐ থলের মধ্যে ঐ দিনের কব্য করা সব রূহ ছিল। ফলে ঐ দিনে যারা মৃত্যুবরণ করেছিল তারা সকলে জিন্দা হয়ে যায়। নাউযুবিল্লাহ! এ ঘটনা বিশ্বাস করলে কারও ঈমান থাকবে না।

[১৩৫] الفرق بين الفرق. عبد القاهر البغدادى

www.waytojannah.com

মাইজভাণ্ডারী

(মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের মতবাদ)

"মাইজভাণ্ডারী পীর" বলতে চট্টগ্রাম মাইজভাণ্ডার দরবার-এর প্রতিষ্ঠাতা শাহসূফী মাওলানা আহমদ উল্লাহ মাইজভান্ডারী-কে বোঝানো হয়েছে। তার পিতার নাম মৌলভী সৈয়দ মতিউল্লাহ। তার মাতার নাম খায়রুন্নেছা। তিনি ১২৪৪ হিজরী মোতাবেক ১২৩৩ বাংলা, ১৮২৬ ইংরেজী ১লা মাঘ রোজ বুধবার জন্মগ্রহণ করেন। চার বৎসর বয়স পার হওয়ার পর তাকে গ্রাম্য মক্তবে আরবী ও বাংলা শিক্ষা দেয়া হয়। ১২৬০ হিজরীতে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। ৮ বৎসর লেখাপড়া করার পর ১২৮৬ সালে কলিকাতা আলিয়া মাদরাসায় লেখাপড়া সমাপ্ত করেন। তারপর এক বৎসর যশোর জেলার বিচার বিভাগে কাজীপদে দায়িত্ব পালন করেন। তার পীর হযরত সুফী সৈয়দ মোহাম্মাদ ছালেহ লাহোরী। মাইজভান্ডারী পীর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে হিজরী ১৩২৩ সনে বাংলা ১৩১৩ সালে ১০ই মাঘ মোতাবেক ২৭ জিলক্বদ সোমবার ইন্তেকাল করেন। তার ইন্তে কালের পর তার পৌত্র মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন তার স্থলাভিষিক্ত হন।[১৩৬]

* মাইজভাণ্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস ঃ

মাইজভাণ্ডার গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ- থেকে বেশ কিছু বই-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে মাইজভাণ্ডারী পীরের পৌত্র মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ হল "বেলায়তে মোতলাকা," "মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার", "মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া" এবং মাইজভাণ্ডারী পীরের জীবনী গ্রন্থ "মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত।" আরও রয়েছে শাহজাদা সৈয়দ মুনিরুল হক, মোনতাজেম গাউছিয়া আহমদিয়া মঞ্জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরীফ কর্তৃক প্রকাশিত মাইজভাণ্ডারী গানের সংকলন- "রত্ন ভাণ্ডার" এবং "আয়েনায়ে বারী ও ফয়জিয়াতে গাউছে মাইজভাণ্ডারী" প্রভৃতি। এসব পুস্তক- পুস্তিকার আলোকে মাইজভান্ডারী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে যা জানা যায় তা হল-

---

[১৩৬] তথ্যসূত্র ঃ গাউছুল মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রহকঃ মাওলানা শাহ ছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভান্ডারী, পঞ্চদশ প্রকাশ জুলাই- ২০০২।

www.waytojannah.com

১. ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদ ঃ

এই "ধর্মনিরপেক্ষাত" কথাটি প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়। বরং এ মতবাদ অনুসারে যে কোন ধর্মের লোককেই তার স্বধর্মে রেখে তাকে মুরীদ বানানো হয় এবং এটাকেই তার মুক্তির জন্য যথেষ্ট মনে করা হয়। মুক্তির জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণের আবশ্যকতা আছে মনে করা হয় না। বরং মনে করা হয়- হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যে কোন ধর্মের লোক নিজ নিজ ধর্মে থেকে সাধনা করে মুক্তি পেতে পারে।

"মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত" গ্রন্থে "হযরতের ধর্ম নিরপেক্ষতা ঃ বৌদ্ধ ধননজয়কে স্বধর্মে রাখিয়া শিক্ষা" শিরোনামে লেখা হয়েছে- একদিন সকালে নাস্তার সময় নিশ্চিন্তাপুর নিবাসী বৌদ্ধ ধননজয় নামক এক ব্যক্তি আসিয়া হযরতের নিকট ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য বারবার অনুরোধ করতে লাগিলেন। হযরত তাহাকে বলিলেন, মিঞা! তুমি তোমার ধর্মে থাক। আমি তোমাকে মুসলমান করিলাম।" ইহার পরও তিনি বসিয়া রহিলেন। হযরতের খাদেম মৌলভী আহমদ ছফা কাঞ্চন নগরী সাহেব তাহাকে পিছন হইতে ইশারা করিয়া ডাকিয়া নিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, তাহাকে হাকিকত্বে মুসলমান করার হইয়াছে। এ গ্রন্থেই আর এক পৃষ্ঠা পরে জনৈক হিন্দু মুন্সেফ অভয়চরণকে স্বধর্মে রেখে দীক্ষা ও উপদেশ দানের কথা বর্ণিত হয়েছে।[১৩৭]

তারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার আর এক নাম দিয়েছে "তাওহীদে আদ্ইয়ান" তথা সর্ব ধর্মের ঐক্য। তাদের বক্তব্য হল যে কোন ধর্ম গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকলে ধর্ম বিরোধ মিটে যায় এবং জনগণকে ধর্ম ঘৃণা থেকে বিমুখ করে তোলা যায়। এভাবে সব ধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা যায়। মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার দ্বিতীয় পলি শাহ সূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মৃত ১৯৮২ ইং) কর্তৃক রচিত "বেলায়তে মোতলাকা" নাম গ্রন্থে 'বেলায়তে মোকাইয়্যাদা যুগ বিকাশ" শিরোনামের অধীন "পরিবর্তীত বেলায়তে মোতলাকা যুগ" উপশিরোনামে লেখা হয়েছে-

"সময়ের ব্যবধান ও ইসলামী হুকুমতের অবসানের ফলে ইসলামী ধর্মজগতে নানা এখতেলাফ বা মতানৈক্য দেখা দেয়। তখন পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা

---

[১৩৭] মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রাহক ঃ মাওলানা শাহসূফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভান্ডারী) পঞ্চদশ প্রকাশ ঃ জুলাই- ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১৫১-১৫২।

www.waytojannah.com

তাঁহার বাতেনী শাসন পদ্ধতির প্রথানুযায়ী সমুচিত হেদায়েত ও উপযুক্ত শক্তিশালী ত্বরীকতের প্রভাবে জগৎবাসীকে অন্ধকার হইতে সহজতম ভাবে উদ্ধার করার মানসে বেলায়তে মোকাইয়্যাদায়ে মোহাম্মাদীকে "বেলায়তে মোতলাকায়ে আহমদী" রূপে পরিবর্তিত করেন।. ইহা বিভিন্ন ধর্মীয় মতবাদকে নীতিগত ভাবে একই দৃষ্টিতে দেখে। কারণ ইহা মনে করে যে, বিভিন্ন মতবাদের "মত ও পথ" বিভিন্ন হইলেও প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল এক।"[১৩৮] তারপর এই কথিত তৌহিদে আদ্ইয়ান বা ধর্ম ঐক্যের প্রমাণ স্বরূপ কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করা হয়েছে ঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَالَّذِيْنَ هَادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِيْنَ مَنْ آمَنَ بِاللّه وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ-

অর্থাৎ, যারা মু'মিন, যারা ইয়াহুদী এবং খৃষ্টান ও সাবিঈন- (এদের মধ্যে) যারাই আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে ও সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। [সূরা বাকারাহ ঃ ৬২]

অথচ এ আয়াতে যে কোন ধর্মের লোকদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা ঈমান আনলে এবং নেক কাজ করলে তারা পরকালে মুক্তি পাবে। আর একথা স্পষ্ট যে, ইসলাম আগমনের পর রাসূল (সা.) কে আখেরী নবী না মানলে তার ঈমান পূর্ণ হবে না। আর রাসূল (সা.) কে আখেরী নবী মানলে অন্যান্য সব ধর্মের বিধানকে রহিত মানতে হয়। তাহলে অন্য কোন ধর্মে থেকে মুক্তির অবকাশ রইল কোথায়?

উক্ত গ্রন্থে আরও লেখা হয়েছে, "মানবের রুচি অনুযায়ী ধর্ম মত গ্রহণের এখতেয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার ধর্ম স্বাধীনতা। এই বিষয় তৌহীদে আদ্য়্যান প্রবন্ধে আলোচনা আছে। ইহা বেলায়তে মোতলাকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা যাহা জনগণকে ধর্ম ঘৃণা বিমুখ করে।"[১৩৯]

---

[১৩৮] বেলায়াতে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহসুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ৫৬-৫৭ ॥

[১৩৯] বেলায়াতে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহসুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ১২৯ ॥

www.waytojannah.com

খন্ডন ঃ

আল্লাহর নিকট একমাত্র ইসলাম ধর্মই গ্রহণযোগ্য। অতএব ইসলাম ধর্ম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মে থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এ ব্যাপারে কুরআনে কারীমে এরশাদ হয়েছে ঃ

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ-

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত ধর্ম হল ইসলাম। [সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯]

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ -

অর্থাৎ, কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্ম সন্ধান করলে কস্মিনকালেও তার থেকে তা গ্রহণ করা হবে না। এমন ব্যক্তি পরকালে চির হতভাগাদের দলে থাকবে। [সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫]

মুসলিম শরীফের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ

والذى نفسى محمد بيده لا يسمع احد هذه الامة يهودى ولا نصرانى ثمى يموت و لم يؤمن بالذى ارسلت به الاكان من اصحاب النانر

অর্থাৎ, এ সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, এই উম্মতের ইয়াহুদী, নাসরানী, যে কেউ আমার কথা শুনবে, অতঃপর আমাকে যাসহ প্রেরণ করা হয়েছে তার প্রতি ঈমান না এনে মৃত্যুবরণ করবে, সে জাহান্নামের অধিবাসী হবে।

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী বলেছেন-

وانما ذكر اليهود والنصرى تنبيها على من سواهما. لأن اليهود والنصارى لهم كتاب فاذا كان هذا شانهم مع ان لهم كتابا فغيرهم ممن لا كتاب لهم اولى- (جـ/١٠)

অর্থাৎ, এখানে ইয়াহুদী, নাসারাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে অন্যদেরকে সতর্ক করার উদ্দেশ্যে। কেননা, ইয়াহুদ নাসারাদের নিকট আসমানী কিতাব রয়েছে, এতদসত্ত্বেও তাদের যখন এই অবস্থা (যে, তাদের মুক্তিও শেষ নবীকে মান্য করার উপর নির্ভরশীল) তখন অন্য যাদের নিকট আসমানী কিতাব নেই তাদের অবস্থাতো অবশ্যই এমন হবে।

অন্য এক হাদীসে রাসূল (সা.) বলেছেন-

لو كان موسى حيا لما وسعه الاتباعى- (مشكوة عن احمد والبهقى)

অর্থাৎ, হযরত মূসা নবীও যদি জীবিত থাকতেন, তবে আমার অনুসরণ না করে তাঁরও কোন উপায় থাকত না।

২. বিশেষ স্তরে শরী'আতের বিধান শিথিল হওয়ার মতবাদ।

উক্ত "বেলায়তে মোতলাকা" গ্রন্থে লেখা হয়েছে ঃ

"শরীয়ত নাছুত বা দৃশ্যমান জগতের অবস্থার সহিত সম্পর্কযুক্ত এবং এই স্তরের লোকদের জন্য অবতীর্ণ।" অতপর নিম্নোক্ত আয়াতের দিকে ইংগিত করে লেখা হয়েছে যে, "যদি কেই মোরাকাবার বা অস্থির বা বাধ্য হ'য় তাহার জন্য এই হুকুম প্রযোজ্য নহে।" যাহা অবস্থাভেদে ব্যবস্থার পরিপোষক বুঝা যায় এবং ইহা খোদার অনুগ্রহ ও ক্ষমার পর্যায়ভূক্ত।[১৪০] আয়াতটি এই

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ-

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নেআমতকে সম্পূর্ণ করলাম আর ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম। [সূরা মায়িদা ঃ ৩]

---

[১৪০] বেলায়াতে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহসুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ১৬ ॥

উক্ত গ্রন্থে "বিধান শিথিল অবস্থা" উপশিরোনামে আরও লেখা হয়েছে ঃ

"ইসলামী শরীয়তী আইন-কানুন মোয়ামেলাত শিথিল যুগে ইহা হকুমতের হুকুমের সঙ্গে যুক্ত হইতে বাধ্য। এবাদতে মোতনাফিয়া আচরণে ছুফীয়ায়ে কেরামগণ গোঁড়া সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে এবং উসকানিদাতা মতলববাজ "আলেম" নামধারী লোকদের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিতে না পারিয়া বহুদিন পূর্ব হইতে মোশাহেদা, মোরাকাবা ইত্যাদি ভিন্ন পন্থাও অবলম্বন করিয়াছিলেন। যেহেতু ত্বরীকত পন্থা শরীয়ত পন্থার পরবর্তী বিধায় লাওয়ামা বা অনুতাপকারী স্তর হইতে আরম্ভ হয়। তাই উপরোক্ত বর্হিদৃষ্ট সম্পন্ন ব্যক্তিদের দৃষ্টির ভঙ্গির সঙ্গে ইহার তফাত দেখা যায়। এই কারণে জিক্‌রে জবানীকে নাছুতী এবং জিক্‌রে কলবীকে মলকূতী বলা হয়।

তারপর "সূফী ধ্যান- ধারনা" উপশিরোনামের লেখা হয়েছে ঃ

"ছূফীয়ায়ে কেরামগণ আত্মশুদ্ধকারী দ্বিতীয় স্তরের "লাওয়ামা" বা অনুতাপকারী চিন্তাশীল জনগণ হন বিধায় তাহারা ত্বরীকত পন্থী। তাহারা এখতেলাফ পরিহার করেন; অলীয়ে কামেলের জ্ঞান জ্যোতিঃ অনুসরণ করেন। বিধান ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার করেন এবং এবাদত বা উপাসনার উপর "এতায়াত" বা আনুগত্যকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেন, যাহা উপাসনার উদ্দেশ্যে।"[১৪১]

এসব কথাার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, বিশেষ কামেল স্তরের ব্যক্তিবর্গের জন্য নামায, রোযা ইত্যাদি বিধান শিথিল হয়ে যায়। বস্তুতঃ এ কারণেই অনেক ভাণ্ডারীকে বাতিনী নামাযের নামে নামায থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়।

* তাদের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে তাদের আরও একটি মতবাদ আছে বলে প্রমাণিত হয়। তা হল ঃ

৩. শরী'আত ও ত্বরীকত ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার মতবাদ ঃ

এই মতবাদের ভিত্তিতেই মনে করা হয় যে, শরী'আত সাধারণ স্তরের মানুষের জন্য। কামেল স্তরের মানুষের জন্য শরী'আতের বিধি-বিধান পালনের বাধ্যবাধকতা থাকে না। শরী'আতের অনেক কিছু জরুরী যা ত্বরীকতের জরুরী নয়।

---

[১৪১] বেলায়াতে মোতলাকা, আলহাজ্জ শাহসুফী সৈয়দ মুনিরুল হক মোনতাজেম দরবারে গাউছুল আজম মাইজভান্ডারী কর্তৃক প্রকাশিত, ৮ম সংস্করণ, এপ্রিল ২০০১, পৃষ্ঠা ১১৮ ॥

www.waytojannah.com

উল্লেখ্য, সুরেশ্বরী পীর ও তার অনুসারীদের আকীদাও অনুরূপ ছিল যে, শরী'আত ও তরীকত ভিন্ন ভিন্ন এবং কামেল ও বুযুর্গ হওয়ার পর তাদের আর ইবাদত লাগে না- এ মর্মে যে আয়াত দ্বারা দলীল প্রদান করে থাকে, সে সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনাও খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৪. পীরের মধ্যে খোদায়িত্ব আরোপ করার মতবাদ ঃ

তারা তাদের বিভিন্ন বইতে এমন সব কথা লিখেছেন যাতে বোঝা যায় তাদের ধারণা মতে পীরের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ ঘটেছে। অর্থাৎ, তাদের পীর আল্লাহর প্রকাশ বা আল্লাহর অবতার। এমনকি স্বয়ং খোদা। যেমন তারা বলেছে ঃ

গাউস বেশ ধৈরে ভবে খেলিতেছে নিরঞ্জনে

তানে ভাবে যেবা ভিন, পাবে না সে প্রভূ চিন ॥[১৪২]

এ কবিতায় মাইজ ভাণ্ডারীকে খোদার প্রকাশ হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। তারা আরও বলেছেন ঃ

আগে কি জানিতাম আমি তুমি হে জগৎ স্বামী

তোমা কৃপা গুণে সব জীবনে জীবনে ॥

জানতেম কি অরুণ শশী দেবমান স্বর্গবাসী

তব গুণে গুণী তব নূরের সৃজন

ছাপে ছিলে মানব ছলে হাদী প্রেমে পর পৈলে

গাউছ বেশ ধরি কোথা পালাবে এখন ॥[১৪৩]

এ কবিতায় মাইজভাণ্ডারীকে খোদার প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে তার খোদা হওয়ার দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এ ধারণা কুফ্‌রী। আরও বল হয়েছে ঃ

সে আজলী সে আবদী সে এবতেদা, সে এন্তহা

সে আওয়ালে সে আখেরে সে জাহেরে সে বাতেনে ॥[১৪৪]

---

[১৪২] রত্নভান্ডার, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২১ প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭॥

[১৪৩] রত্নভান্ডার, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭॥

আরও বলা হয়েছে ঃ

আউয়াল আখের তুমি জাহের বাতেন তুমি
তুমি হে নূরের ছটা সারা ভূবন মোহন ॥
ওহে কর্ত্তা জগরক্ষা ভিক্ষকের দেও ভিক্ষা
কর হাদীর প্রাণ রক্ষা প্রিয়া গাউছ ধন ॥[১৪৫]

এ কবিতায় খোদার জন্য যে সব সিফাত প্রযোজ্য সে সব মাইজভাণ্ডারীর জন্য প্রয়োগ করা হয়েছে। এভাবে তাকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়া হয়েছে, যা চরম গোমরাহী। আরও বলা হয়েছে ঃ

আহ্‌মদে বেমিম তুজহে কাহতা হোঁ ওয়াল্লাহ
মিমকি পর্দ্দা কো মর ভিতু উঠা দাও ॥[১৪৬]

এ কবিতায় পরিস্কার বলা হয়েছে যে আল্লাহ হলে আহাদ। আর মাইজভান্ডারী হলে আহমদ। এই আহাদ ও আহমদের মধ্যে পার্থক্য কেবল একটা মীম হরফের। নতুবা আল্লাহ ও মাইজভাণ্ডারীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

৫. হায়াত-মওতের ব্যাপারে পীরের নিয়ন্ত্রণ ঃ

মাইজভাণ্ডারীগণ মনে করেন তাদের পীরের মধ্যে মানুষের হায়াত-মওতের ব্যাপারেও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়েছে। জীবনী ও কারামত গ্রন্থে "হযরতের বেলায়তী ক্ষমতায় আজরাঈল হইতে রক্ষা ও মৃত্যু সময় পরিবর্তন" শিরোনামে মাইজভাণ্ডারী সাহেবের জনৈক ভক্ত মৌলভী আবদুল গণি সাহেব সম্পর্কে লেখা হয়েছে যে, তিনি একবার অসুস্থ হওয়ার পর একদিন হঠাৎ বেহুশ হয়ে পড়লে দেখতে পান যে, আজরাইল কদাকার ভীষণ আকৃতিতে একখানা অসি নিয়ে তার বুকের উপর বসে তার গলায় অসি চালাতে উদ্যত। এমনি সময় গাউসুল আজম (মাইজভাণ্ডারী সাহেব) সেখানে হাজির হলেন। তিনি তার অসি ছিনিয়ে নিলেন এবং তাকে বললেন ঃ

---

[১৪৪] প্রাগুক্ত, প্রথম খন্ড, পৃষ্ঠা- ২১ ॥
[১৪৫] রত্নভান্ডার, দ্বিতীয় খন্ড, পৃষ্ঠা- ১১, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭॥
[১৪৬] প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা- ২ ॥

www.waytojannah.com

"তুমি এখনই ফিরিয়া যাও। আমি তাহাকে এক সপ্তাহের সময় দিলাম। তাহার সাথে আমার দরকারী কাজ আছে। তখন আজরাইল হযরতকে কিছু বলিতে চাহিলে, তিনি অতিশয় নারাজ হইয়া বলিয়া উঠিলেন ঃ এখনই যাও। তোমার খোদাকে আমার কথা বলিও। আমি সময় দিয়াছি।" তখন আজরাইল চলিয়া গেল। তিনি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিলেন।[১৪৭]

পীর সম্বন্ধে এমন আকীদা হায়াত মওত সম্পর্কিত আকীদার পরিপন্থি। তদুপরি কোন মানুষ আল্লাহ ও ফেরেশতার উপর এমন মতবরী দেখাতে পারে তা বিশ্বাস করা ঈমান বিরোধী।

উল্লেখ্য ঃ এ শ্রেণীর লোকেরা পীরকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছে। তার পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করেছে। পীর খোদার প্রকাশ, পীরের মধ্যে প্রাণ রক্ষা করার ক্ষমতা হায়াত-মওত পীরের হাতে থাকা ইত্যাদি খোদায়ী গুণ থাকাকে সাব্যস্ত করেছে। পূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি- যারা আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য না করার মত পোষণ করেন বা মানুষের মধ্যে আল্লাহর প্রবেশ করার মত পোষণ করেন বা পীর মাশায়েখকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেয়, পীরকে খোদার প্রকাশ বলে, বা পীরের মধ্যে খোদায়ী গুণ আরোপ করে, তারা এ বিষয়ে সাধারণত ঃ وحدة الوجود বা"সর্বেশ্বরবাদ"- দর্শনের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে এটা করে থাকেন। এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. পীর কর্তৃক পরকলে মুক্তি পাওয়ার মতবাদ ঃ

দাসগণের প্রাণ হরিতে - ভয় নাহি দূত সমনে
ফুল দেখাই প্রাণ হরিবে - নিজ হাতে গাউছ ধন
মন্‌কির নকিরের ডর- কবরে নাহিক মোর
আদবের চাবুক মেরে হাঁকাইবেন গাউছ ধন
কবর কোশাদা হবে - পুষ্পশয্যা বিছাইবে
সামনে বসি হাল্‌কা বন্দি - করাইবেন গাউছ ধনে
হীন দাস হাদী কয় - হাশরেতে নাহি ভয়

[১৪৭] মাইজভান্ডারীর জীবনী ও কেরামত, সংকলন সংগ্রাহক ঃ মাওলানা শাহছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন (মাইজভান্ডারী), পঞ্চদশ প্রকাশঃ জুলাই- ২০০২, পৃষ্ঠা ঃ ১২৯।

www.waytojannah.com

পিছে পিছে দাসগণ ফিরাইবেন গাউছ ধন[১৪৮]

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

গাউছজি, মাওলাজি ডাকছি তোমারে
নাছুতী সঙ্গটে উদ্ধারিত মোর
দিন দুনিয়ার ছোওয়াব ও গুনা.....
মিজানের পাল্লাখানা, পোলছেরাতের ভাবাগোনা
রেহাই দেও মোরে।

উল্লেখ্য ঃ আটরশি পীরের মতবাদও অনুরূপ ছিল। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৭. পীর কর্তৃক কামনা-বাসনা পূরণ হওয়ার মতবাদ ঃ

এ প্রসঙ্গে তাদের নিম্নোক্ত কবিতাটি তুলে ধরা যায় ঃ

ভাণ্ডারীকে যে পাইল- খোদা রাসূল সে চিনিল
গাউছুল আজম মাইজভাণ্ডারী পূর্ণ করেন বাসনা[১৪৯]

উল্লেখ্য, এনায়েতপুরী ও আটরশি পীরের মতবাদও অনুরূপ ছিল। তাদের আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

৮. গান-বাদ্য জায়েয হওয়ার মতবাদ ঃ

তারা লিখেছেন- "যাহারা ছেমায় আসক্ত, ছেমা বা গান বাদ্যজনিত জিকির বা জিকরী মাহফিল করিতে চাহেন তাহাদের জন্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে জিকির বা জিক্‌রী মাহফিল করিবার অনুমতি ও অনুমোদন আছে।[১৫০]

উল্লেখ্য ঃ গান-বাদ্য ও সামা অবৈধ হওয়া প্রসঙ্গে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

---

[১৪৮] রত্নভান্ডার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১৭, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ॥
[১৪৯] রত্নভান্ডার প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩৩, প্রকাশক সৈয়দ মুনিরুল হক, ৮ম সংস্করণ, ১৯৯৭ ॥
[১৫০] "মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউছিয়া" মাইজভাণ্ডারীর দ্বিতীয় পীর- শাহছুফী সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন কর্তৃক সম্পাদিত, ১১শ সংস্করণ, জুন ২০০২ পৃষ্ঠা ৪ ॥

www.waytojannah.com

বে শরা পীর- ফকীর

"বে শরা পীর-ফকীর" বলতে বোঝানো হচ্ছে যারা নিজেদেরকে পীর ফকীর বলে দাবী করে অথচ শরী'আত মেনে চলে না। যেমন নামায পড়ে না, গান-বাদ্য করে, মদ গাঁজা খায়, শরী'আতের পর্দা মেনে চলে না, নারী পুরুষ অবাধে পর্দাহীনভাবে একত্রে জিক্‌রের আসর বসিয়ে ঢলাঢলি করে। এদের অনেকে জটা রাখে, অনেক উলঙ্গ থাকে, অনেকে রঙ-বেরংয়ের তালি লাগানো কিম্ভূত কিমাকার কাপড়-চোপড় পরিধান করে নিজেদের বুযুর্গী প্রকাশের প্রয়াস পায় ইত্যাদি। এরা নিজেদেরকে মা'রেফাতপন্থী বলে দাবী করে। তাদের দাবী হল শরী'আত ও মা'রেফাত ভিন্ন ভিন্ন। শরী'আত হল জাহিরী বিধি-বিধান আর মা'রেফাত হল বাতিনী বিধি-বিধান। জাহিরী শরী'আতে যা নাজায়েয মা'রেফাতের পন্থায় তা জায়েয। অনেকে এ ধরনের পীর-ফকীরকে "ন্যাড়ার ফকীর" বলে আখ্যায়িত করে থাকেন।

এ জাতীয় পীর-ফকীরদের শরীআত পরিপন্থি আকীদা-বিশ্বাস প্রচুর। তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উল্লেখ ও সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত খণ্ডন পেশ করা হল ঃ

১. শরী'আত ও মা'রেফাত ভিন্ন ভিন্ন। শরী'আত হল যাহিরী বিধি-বিধান আর মা'রেফাত হল বাতিনী বিধি-বিধান। যাহিরী শরী'আতে যা নাজায়েয মা'রেফাতের পন্থায় তা জায়েয। তারা বলে আমরা যাহিরী শরী'আতের উপর নয় বরং বাতিনী শরী'আতের উপর আমল করি।

খণ্ডন ঃ

তারা যাহেরী শরী'আত ও বাতেনী শরী'আত বলে দুইটা শরী'আত দাঁড় করেছেন। পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, এর কোন দলীল কুরআন-হাদীসে নেই। তদুপরি শরী'আত থেকে তরীকতকে পৃথক করে নিলে শরী'আত তথা শরী'আতের বিধি-বিধানকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়, যা শরী'আতকে রহিত সাব্যস্ত করার ন্যায়। এ ধরনের বিকৃতি সাধনকারী লোকদেরকে বলা হয় মুলহিদ বা যিন্দীক।

নিম্নে সহীহ মুসলিম-এর ব্যাখ্যাকার ইমাম আবুল আব্বাস কুরতুবী (রহ.)-এর একটি যুক্তিপূর্ণ বিশদ আলোচনার সারাংশ সামান্য ব্যাখ্যাসহ তুলে ধরা হল। তিনি বলেন-

"যিন্দীকদের একটি গ্রুপ এমন তাসাওউফের কথা বলে, যার ফলে শরী'আতের বিধানাবলীকে সম্পূর্ণভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেয় হয়। তার বলে- শরী'আতের এসব বিধি-বিধান নির্বোধ ও সাধারণ লোকদের জন্যে। আউলিয়ায়ে কেরাম ও বিশেষ

ব্যক্তিবর্গ শরী'আতের এসব বিধানাবলীর মুখাপেক্ষী নন। (বরং তার এসব কিছুর উর্ধ্বে)। কারণ তাঁদের অন্তঃকরণ স্বচ্ছ ও নির্মল। তাই তাদের অন্তরে যা কিছুর উদ্রেক হয়, তাই তাঁদের থেকে কাম্য'- এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফ্‌রী কথা। এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তাদেরকে কতল করে দিতে হবে। তাওবাও তলব করা হবে না। কেননা, এ মতবাদের মধ্যে শরী'আতের একটি সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পাওয়া যায়। সে আকীদাটি হল, 'আল্লাহ তা'আলার বিধানাবলী আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া অবগতির কোন উপায় নেই।' আর শরী'আতের কোন সুস্পষ্ট ও অকাট্য আকীদার অস্বীকৃতি পরিস্কার কুফর।"[১৫১]

২. এজন্য তারা বাতিনী নামাযের প্রবক্তা। তাদের অনেকে বলে আমরা বাতিনী নামায পড়ি।

খণ্ডন ঃ

পূর্বে আলোচনা করা হল যে, এটা সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কুফ্‌রী কথা। যারা এ ধরনের আকীদা রাখে বা এ ধরনের কথাবার্তা যারা বলে, তারা যিন্দীক ও কাফের। বাতিনী নামায নামায নয় বরং বলা যায় সেটা নামাযের কল্পনা। শরী'আতে নামায আদায় করতে বলা হয়েছে নামাযের কল্পনা করতে বলা হয়নি। রাসূল (সা.) স্বশরীরে নামায আদায় করে নামায কিভাবে আদায় করতে হবে তা দেখিয়ে গেছেন। সুতরাং ক্বলব দ্বারা নামায নয় বরং স্বশরীরেই নামায আদায় করতে হবে।

৩. তারা বলে ক্বলব ঠিক থাকলে সব ঠিক। ক্বলব ঠিক থাকলে যাহিরী ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন পড়ে না। অর্থাৎ ইয়াক্বীন অর্জন হয়ে যাওয়ার পর আর ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন থাকে না।

খণ্ডন ঃ

এ ব্যাপারে ইতিপূর্বে কিছু খণ্ডন পেশ করা হয়েছে। সুরেশ্বরী, আটরশী ও মাইজভাণ্ডারীদের অনুরূপ আকীদা-বিশ্বাস রয়েছে। সুরেশ্বরী, আটরশী ও মাইজভাণ্ডারীদের আকীদা-বিশ্বাস পর্যালোচনার প্রাক্কালে এতদসম্পর্কিত বিস্তারিত খণ্ডন পেশ করা হয়েছে।

---

[১৫১] تفسير قرطبى. جـ/١١. صفحـ/٢٩-٢٨، فتح البارى جـ/١ ، صفحـ/٢٦٧.

৪. তারা বলে কুরআনের ত্রিশ পারা যাহির আর দশ পারা বাতিন। এই বাতিনী দশ পারা বাতিনী পীর-ফকীরদের সিনায় সিনায় চলে আসছে। তাদের কেউ কেউ এমনও বলেন যে, মে'রাজে রাসূল (সা.) ৯০ হাজার কালাম লাভ করেছিলেন। উলামায়ে কেরাম কেবল ৩০ হাজার কালাম জানেন। অবশিষ্ট ৬০ হাজার কালাম এসব সূফী ফকীরদের নিকটই রয়েছে। যা তারা সিনা পরম্পরায় লাভ করেছেন।

খণ্ডন ঃ

সিনায় সিনায় চলে আসা এসব বিদ্যা তারা কিভাবে লাভ করলেন? কে কাকে কখন কিভাবে শিক্ষা দিল? তার সনদ কি? সনদ ছাড়া দ্বীনের কোন কথা গ্রহণযোগ্য নয়। এর সনদ তারা কোন দিন দিতে সক্ষম হবে না। সনদা ছাড়া দ্বীনের কথা গ্রহণযোগ্য হলে যে যা ইচ্ছা তা দ্বীনের নামে চালিয়ে দিতে পারবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক তাই বলেছেন-

الاسناد من الدين لولا الاسناد لقال من شاء ماشاء– (مقدمة مسلم)

অর্থাৎ, সনদ দ্বীনের অংশ। সনদ না থাকলে যার যেমন ইচ্ছা তেমন বলে যেত।

এ ধরনের চিন্তাধারা শী'আদের থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে সাবা শী'আদের মধ্যে এই ধারণা ছড়িয়ে ছিল যে, নবী করীম (সা.) আহলে বাইতকে বিশেষতঃ হযরত আলী (রা.) কে কিছু বিশেষ গোপন তথ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন, যা সাধারণ্যে ফাঁস করা হয়নি। তারপর সে মনগড়া একটা তথ্য ব্যক্ত করে সেটাকে সেই গোপন তথ্যের নামে চালিয়ে দিয়ে উম্মতের একটা বিরাট গোষ্ঠিকে ধ্বংস করে দিয়েছে।

রাসূল (সা.) দ্বীনের কোন কথা গোপন রাখেননি। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনি যা প্রাপ্ত হয়েছেন, তা সবই উম্মতের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ বিষয়টি প্রমানিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ–

অর্থাৎ হে রাসূল ! তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা তোমার নিকট প্রেরিত হয়েছে, তা পৌঁছে দাও। অন্যথায় তোমার রেসালাতের দায়িত্ব পৌঁছালে না।

বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষাধিক সাহাবীর সম্মুখে তিনি তিনবার বলেছেন ঃ

الا هل بلغت ؟ الا هل بلغت؟ الا هل بلغت؟

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি? তিনবার তিনি এভাবে জিজ্ঞাসা করলেন। সমবেত সাহাবীগণ উত্তর দিয়েছিলেনঃ হ্যাঁ। তারপর তিনি আল্লাহকে এ মর্মে সাক্ষী রেখে বলেছিলেন ঃ

اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد-

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।

৫. তারা গায়েরে মাহ্‌রাম নারী-পুরুষের পর্দাহীভাবে যিকির ও ঢলাঢলিকে বৈধ বলে কার্যতঃ নারী-পুরুষের মধ্যে পর্দা ফরয- এই বিধানকে অস্বীকার করে।

খন্ডন ঃ

গায়েরে মাহ্‌রাম নারী-পুরুষের মধ্যকার পর্দার বিধান ফরয। এটা نصوص قطعيه দ্বারা প্রমাণিত। এরূপ বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ-[সূরা নূর, আয়াত ঃ ৩১]

৬. তাদের মতে যে কোন পুরুষ যে কোন নারীকে ভোগ করতে পারে।

এ জাতীয় ফকীরদের অনেকে অবাধ যৌন মিলনকে সিদ্দি লাভের সহায়ক মনে করে।[১৫২] তারা মনে করে পঞ্চ রসই শক্তির আধার। পঞ্চ রস হল- মল, মূত্র, বীর্য, ঋতুর রক্ত ও শ্লেষ্মা। তারা নিজ স্ত্রীর বা পরস্ত্রীর মিলনে যে রস নিঃসৃত

[১৫২] এটাকে শয়তানিয়্যাত সিদ্ধি বলা হলেই যথার্থ হবে ॥

হয়, তা সেবনকে 'রতি সেবন' বলে। কেউ কেউ 'লাল সাধন' কেউ কেউ 'গুটি সাধনও' বলে। তারা একে অপরের স্ত্রীর সাথে যৌন মিলনে অসন্তোষ প্রকাশ করে না। এই অসন্তোষ প্রকাশ না করা তাদের মতে আত্মশুদ্ধির প্রধান লক্ষণ। তারা বলে নারীগণ হল বহতা নদীর মত। নদীর মধ্যে যে কোন ময়লা আবর্জনা পড়লে যেমন নদী নাপাক হয় না, তদ্রূপ নারীর যোনীতে পর পুরুষের বীর্য পড়লে তা নাপাক হয় না। তারা আরও বলে নারীগণ গঙ্গা স্বরূপ। আর তাদের মিলন প্রত্যাশী পুরুষগণ হল স্নানার্থী তীর্থ যাত্রী স্বরূপ। আর গঙ্গা স্নানে তথা যৌন মিলনে কারও কোন আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে না।

তারা বলে দলে দলে একত্রে স্ত্রী পুরুষ মিলে নাচ গান করলে কামরিপু দমন হয়। যেমন একে অপরের স্ত্রীকে ব্যবহার করলে হিংসা রিপু দমন হয়। তারা অবাধ যৌনচারিতায় যে বীর্যপাত হয় তা ময়দার সাথে মিশিয়ে রুটি বানিয়ে ভক্ষণ করে। এটাকে তারা নাম দিয়েছে "প্রেমভাজা"। (নাউযু বিল্লাহি মিন যালিকা)

খণ্ডন ঃ

এসব কথার মাধ্যমে তার যেনাকে বৈধ করেছ। যেনা কুরআন হাদীসের স্পষ্ট ভাষ্য অনুসারে হারাম। আর যেনা হারাম হওয়ার বিষয়টি একটি বদীহী বা সর্বজন বিদিত বিষয়। এরূপ বিষয়কে অস্বীকার করা কুফ্‌রী। অতীতে মুরজিয়া নামক একটি গোমরাহ ফিরকার অনুরূপ আকীদা ছিল। তারা বলত ঃ নারীগণ বাগানের ফুলের ন্যায়। যে ইচ্ছা সে ভোগ করতে পারে- বিবাহ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই।[১৫৩] এ আকীদা উম্মতের সর্বসম্মত মতে কুফ্‌রী।

৭. তাদের মতে গান- বাদ্য করা বৈধ।

খণ্ডন ঃ

গান-বাদ্য হারাম। কোন হারামকে হালাল মনে করা কুফ্‌রী। গান-বাদ্য হারাম এ সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮. তাদে মতে মদ গাঁজা খাওয়া বৈধ।

তারা শুধু মদ গাঁজা নয়, হায়েয, নেফাস, বীর্য, মল, মূত্র ইত্যাদিও ভক্ষণ করে। তারা বলে এগুলো ভক্ষণ দ্বারা রিপু দমন হয়।

---

[১৫৩] كما فى مقدمة عقيدة الطحاوى.

খণ্ডন ঃ

মদ গাঁজা সম্পূর্ণ হারাম। এটা শয়তানী কর্ম। এটা *نصوص قطعيه* দ্বারা প্রমাণিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ-

অর্থাৎ, মদ, জুয়া, বেদী ও তীর (নিক্ষেপের মাধ্যমে ভাগ্য নির্ধারণ) এগুলো শয়তানের কাজ। অতএব তা থেকে বিরত থাক। [সূরা মায়িদা ঃ ৯০]

এমনিভাবে হায়েয, নেফাসের রক্ত, বীর্য, মল-মুত্রও হারাম। কুরআন হাদীসের বহু ভাষ্য দ্বারা এগুলি হারাম হওয়া প্রমাণিত। আর কোন হারামকে হালাল মনে করা কুফ্‌রী।

৯. তার পীর ফকীরদের মধ্যে আল্লাহর হুলূলের আকীদা রাখে অর্থাৎ, তারা মনে করে পীর-ফকীরদের মধ্যে আল্লাহর প্রকাশ ঘটে। তারা শিক্ষা দেয়, "যেহী মুরশিদ সেহি খোদা"। এভাবে তারা পীর-মুরীদির অন্তরালে শির্‌কের শিক্ষা প্রদান করে। তারা পীর ফকীরদের মধ্যে আল্লাহর হুলূলের আকীদা রাখে- এ প্রসঙ্গে তাদের বহু গান বা কবিতার কথা উল্লেখ করা যায়। যেমন লাল মাহমুদ গেয়েছে-

আল্লাহ নবী দুই অবতার
এক নূরেতে দুই মিশকাত কর
এ নূরে সাধিলে নিরঞ্জনকে
অমনি তাতে যাবে ধরা ॥

আরও উল্লেখ করা যায়-

মন পাগলরে গুরু ভজনা
গুরু বিনে মুক্তি পাবিনা
গুরু নামে আছে শুধা,
যিনি গুরু তিনিই খোদা,
মন পাগলরে গুরু ভজনা ॥

খণ্ডন ঃ

পূর্বে সুরেশ্বরী পীরের আকীদা-বিশ্বাস পর্যালোচনা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যে, হুলুলের আকীদা শিরক। আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা হল আল্লাহর সত্তা কারও সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দ্রবীভূত হন না বা প্রবেশ (حلول) হন না এবং তাঁর সত্তার মধ্যে মিশ্রিত বা দুরীভূত হয় না। খৃষ্টানদের ধারণায় আল্লাহ তা'আলা হযরত ঈসা (আ.)-এর মধ্যে প্রবেশ (حلول) করেছিলেন অর্থাৎ অবতারিত হয়েছিলেন। হিন্দুদের বিশ্বাস মতে ঈশ্বর মানুষ, প্রাণী, বৃক্ষপাথর সবকিছুর মধ্যে প্রবেশ(حلول) করেন অর্থাৎ অবতারিত হন। এরূপ বিশ্বাস পোষণকারীদেরকে হুলূলিয়া (حلولية) বলা হয়। এরূপ বিশ্বাস কুফরী।

মাওলানা আব্দুল হক হক্কানী বলেন- যেসব মুর্খ লোক বলে, আল্লাহর খাস ওলীগণ আল্লাহর সত্তার মধ্যে এমনভাবে লীন হয়ে যান, যেমন বরফ পনির মধ্যে এবং বিন্দু দরিয়ার মধ্যে লীন হয়ে যায়, (ফলে তার এবং আল্লাহর মধ্যে আর পার্থক্য করা যায় না।) এটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং স্পষ্ট কুফ্র।[১৫৪]

১০. তারা পীর-ফকীরদেরকে খোদার স্তরে নয় বরং খোদার চেয়ে উপরে তুলে নিয়ে যায়। তাদের মুখ থেকে বের হয় ঃ

খোদার ধন রাসূলকে দিয়া
খোদা গেছেন খালি হইয়া
রাসূলের ধন খাজাকে দিয়া
রাসূল গেছেন খালি হইয়া।
.....ইত্যাদি।

খণ্ডন ঃ

এরূপ আকীদা বিশ্বাস যে কুফরী তার বিশদ বিবরণ প্রদান নিষ্প্রয়োজনীয়।

এছাড়াও এসব বে-শরা পীর-ফকীররা পীর বা পীরের কবরকে সাজদা করে, তারা মহিলা মুরিদদের থেকে খেদমত নেয়, মেয়েলোক নিয়ে জিকির করে, ঢলাঢলি করে। ইত্যাদি বহু শরী'আত বিরুদ্ধ আকীদা ও আমলের অনুসারী তারা।

---

[১৫৪] عقائد الاسلام عبد الحق حقانى

বাউল সম্প্রদায়

* "বাউল" শব্দের উৎপত্তি ঃ

"বাউল" শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। কেউ কেউ বলেছেন বাউল শব্দটি আরবী "আউয়াল" শব্দ থেকে উদ্ভূত এবং তা থেকে বাউল। কেউ কেউ বলেন বাউল্যা হতে বাউলা ও বাউলা হতে বাউল আর "আউলিয়া" হতে আউল্যা, আউল্যা হতে আউলা ও আউলা হতে আউল। আউল এবং বাউল শব্দদ্বয় সমার্থবোধক। কেউ কেউ বলেন ফাসরী 'বা' প্রত্যয় অর্থের সাথে গ্রাম্য 'উল' (যার অর্থ সন্ধান) যোগ হয়ে বাউল হয়েছে। এখন বাউল শব্দের অর্থ যে ব্যক্তি সন্ধানের সাথে বা মনের মানুষের সন্ধানে বর্তমান। যেমন মুসীরম সাধকগণ নিজেদেরকে তালিবুল মাওলা বলেন তেমনি বউলগণ নিজেদেরকে বাউল বা তালিবুল মাওলা বলেন। কেউ কেউ বলেন সংস্কৃত 'বাতুল' (অর্থ উন্মাদ) শব্দের প্রকৃত রূপ 'বাউর' ও হিন্দী শব্দ 'বাউরা' (অর্থ পাগলা) হতে বাউল শব্দের উৎপত্তি। তাদের ব্যাখ্যা মতে বাউলগণ পোষাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ও আপন ভাবে মশগুল ও উন্মাদ প্রকৃতির হয়ে থাকে বিধায় তাদেরকে বাউল বলা হয়।

* বাউলদের নাম ঃ

বাংলাদেশে ও পশ্চিম বঙ্গে লালন ও তার অনুসারী ফকীরদেরকে বাউল, বে-শরা ফকীর, নেড়ার ফকীর ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়। কদাচিৎ বাউল নামেও তারা পরিচিত।

* বাউলদের শ্রেণী ভাগ ঃ

মোটামুটি ভাবে বাউলদের দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা হয়।

১. হিন্দু জাতির বাউল তথা বৈষ্ণব, বৈষ্ণব-বাউল, বাউল-মোহান্ত, বৈষ্ণব-রসিক প্রভৃতি।

২. মুসলমান জাতির বাউল তথা পীর, কুতুব, সাঁই, ফকীর প্রভৃতি।

* বাউল মতের প্রবর্তক ও এই মতের উদ্ভবকাল ঃ

বাউল মতের উদ্ভবকাল ও এ মতের প্রবর্তক কে এ সম্পর্কেও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য বলেন- মুসলমানেরা বা বে-শরা ফকীরই বাউল ধর্ম সাধনার আদি প্রবর্তক। কেউ কেউ বলেন বাউল সম্প্রদায়ের আদি গুরু চৈতন্যদেব। বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এই শ্রেণীর সকল সাধকই বাউল। কেউ কেউ বলেন বাউল মতের আদি প্রবর্তক বলে খ্যাত ব্যক্তির নাম হল আউল চাঁদ। বাউল গবেষকদের অনেকের মতে মুসলমান মাধব বিবি ও আউল চাঁদই এ মতের প্রবর্তক। মোটামুটি ভাবে ১৭ শতকের দ্বিতীয় পাদ থেকেই বাউল মতের উন্মেষ।

* বাউলদের কতিপয় দর্শন ও রীতি-নীতি ঃ

বিস্তারিত অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বাউলগণ নির্দিষ্টভাবে হিন্দু বা মুসলিম কোন সম্প্রদায়েরই আচার-আচরণ বা দর্শনের অনুসারী নয়। বরং বাউলদের অনেকগুলি নিজস্ব বিশেষ দর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি দর্শন ও ইসলামের দৃষ্টিতে সে সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা পেশ করা হল ঃ

১. চার চন্দ্র ভেদতত্ত্ব ঃ

"চার চন্দ্র" বলতে বোঝায় শুক্র, রজঃ বিষ্ঠা, ও মুত্র। বাউলদের মতে সিদ্ধি অর্জন করার জন্য এই চারচন্দ্র সাধনার গুরুত্ব অপরিসীম। বাউলদের দাবী হল চারচন্দ্র সাধনায় কামজয়। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা যোগে বাউলগণ প্রকৃতি আশ্রয়ী হয়ে সাধনা করতে গিয়ে তারা পানক্রিয়া অনুষ্ঠান করে এ সব পান করে থাকে।

এই চারচন্দ্র-ভেদ সাধনার জন্য বাউলরা হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সকলের কাছে অত্যন্ত নিন্দিত; যদিও বাউল সাধনার দৃষ্টিকোন থেকে তা খুবই প্রশংসনীয়। ইসলামের দৃষ্টিতে মল, মুত্র, মনী বা বীর্য ও ঋতু স্রাব- এসব ভক্ষণ করা হারাম। অতএব হারামকে যারা হালাল মনে করে তাদের ঈমান থাকে না। আর হারাম উপায়ে কৃত কোন সাধনা ইসলামে স্বীকৃত ও কাম্য নয়।

উল্লেখ্য, বাউলগণ শুক্র বা বীজকে ঈশ্বর আখ্যায়িত করে থাকেন। তাই সিদ্ধি অর্জনের জন্য শুক্র বা বীজ ভক্ষণ তাদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ হওয়ারই কথা। বাউল গবেষক ডক্টর উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লালন শাহ তথা বাউল সম্প্রদায়ের ধর্মমত

সম্পর্কে বলেন, "বাউলগণ পুরুষদের বীজরূপী সত্তাকে ঈশ্বর বলেন। বাউলদের মতে এই বীজ সত্তা বা ঈশ্বর রস ভোক্তা, লীলাময় ও কাম ক্রীড়াশীল।"

বীজকে ঈশ্বর আখ্যায়িত করার কারণে অনেকে বাউলদেরকে বীজেশ্বরবাদী বলে অভিহিত করে থাকেন। এই বাউলদের অনেকে বলে থাকেন "বীজমে আল্লাহ"।

উল্লেখ্য- বীজকে ইশ্বর আখ্যায়িত করে বাউলগণ আল্লাহর পরিচয়কে বিকৃত করেছেন। এরূপ ব্যাখা ও পরিচয়ে আল্লাহকে বিশ্বাস করা অবিশ্বাস করারই নামান্তর। এ দৃষ্টিকোন থেকেও বাউল দর্শন একটি ইসলাম বিবর্জিত ও ঈমান পরিপন্থী দর্শন।

২. মনের মানুষ তত্ত্ব ঃ

বাউলগণ আল্লাহ, অচিন পাখী, মনের মানুষ, আলেক সাঁই ইত্যাদিকে সমার্থবোধাক মনে করে থাকেন। আত্মসন্ধানের মাধ্যমে তাদের এই কথিত "মনের মানুষ"-এর কি অর্থ তা নিয়ে বাউল সন্ধানই তাদের প্রধান লক্ষ্য। তাদের "কথিত "মনের মানুষ"-এর কি অর্থ তা নিয়ে বাউল গবেষকদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন এ দ্বারা উদ্দেশ্য হল অন্তরস্থিত নূর, যে নূর দ্বারা মুহাম্মদকে তৈরি কর হয়েছিল অর্থাৎ, এর দ্বারা নূরে মোহাম্মাদী বোঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী মনের মানুষকে সন্ধান করা আল্লাহকে সন্ধান করার নামান্তর নয়। কেউ কেউ বলেন "মনের মানুষ" দ্বারা আল্লাহকে বোঝানো হয়েছে। কেননা আল্লাহ মানুষের অন্তরে সমাহিত হয়ে থাকেন। যাহোক এভাবে বাউলগণ আল্লাহর পরিচয়কে অস্পষ্ট করে তুলেছেন। ইসলামী আকীদা মতে নূরে মুহাম্মাদী আর আল্লাহ সমার্থবোধক নয়। তাছাড়া আল্লাহ কোন মনের মানুষ নন। তিনি সমস্ত উত্তম গুণাবলীর এক সত্তা। তাঁর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিরাজমান। তিনি কোন মানুষের অন্তরে অবস্থান গ্রহণ করেন না। তিনি স্থান ও কালের উর্ধ্বে। অতএব বাউল কথিত মনের মানুষকে সন্ধান করা আদৌ আল্লাহকে সন্ধান করার সমান্তরাল নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাউলগণের ধারণায় আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যিনি আল্লাহ তিনিই রাসূল। তাই তাদের কথিত মনের মানুষের ব্যাখ্যা আল্লাহ ও রাসূল উভয়ই হতে পারে তাতে কোন বৈপরিত্য নেই।

৩. আল্লাহ ও রাসূল এক হওয়ার তত্ত্ব ঃ

কেবল মাত্র বলা হল বাউলগণের ধারণায় আল্লাহ ও রাসূলের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যিনি আল্লাহ তিনিই রাসূল। এ প্রসঙ্গে বাউলশ্রেষ্ঠ লালন বলেন ঃ

আছে আল্লাহ আছে রাসূল
এতে কোন ভুল নাই
আল্লাহ স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা
এই এক 'সৃষ্টকর্তা সৃষ্টি করে সার,
যে নিরঞ্জন সেই নূর নবী নামটি ধরে,
কে পারে সে মকর উল্লাহ মকর বুঝিতে
আহাদে আহামদ নাম হয় জগতে,
আত্মতত্ত্বে ফাজিল যে জনা,
জানতে পায় নিগুঢ় কারখানা,
হল রছূল রূপে প্রকাশ রব্বানা ॥

উল্লেখ্য আহাদ ও আহমদের মধ্যে শুধু একটি মীম হরফের পার্থক্য এছাড়া আহাদ তথা আল্লাহ ও আহমদ তথা নবীর মধ্যে আর কোন পার্থক্য নেই- এরূপ দর্শন মাইজভাণ্ডারীগণও পোষণ করে থাকেন। এনায়েতপুরীদের মতবাদ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে এ মতবাদটির কুফ্‌রী মতবাদ হওয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৪. মুরশিদ তত্ত্ব ঃ

বাউলদের একটি প্রসিদ্ধ তত্ত্ব হল মুরশিদ তত্ত্ব। একে পীরতত্ত্ব বা গুরুতত্ত্বও বলা হয়। তারা আল্লাহ ও রাসূলেল মধ্যে যেমন পার্থক্য করেনা, তদ্রুপ আল্লাহ ও মুর্শিদের মধ্যেও কোন পার্থক্য করে না। এ প্রসঙ্গে তাদের প্রসিদ্ধ উক্তিটি উল্লেখ্য ঃ"যেহি মুরশিদ সেহি খোদা"। লালন (মুর্শিদকে লক্ষ্য করে) বলেন ঃ

আপনি খোদা আপনি নবী
আপনি সেই আদম ছবি
অনন্ত রূপ ধরে ধারণ
কে বোঝে তার নিরাকারণ
নিরাকার হাকিম নিরঞ্জন
মুর্শিদ রূপ ভজন পথে ॥

তিনি আরও বলে ঃ

মোরশেদ বিনে কি মন ধন আর আছে রে এ জগতে
মোরশেদের চরণ সুধা
পাণ করলে হবে ক্ষুধা
করনা আর দেলে দ্বিধা
যেহি মোরশেদ সেহি খোদা ॥

উল্লেখ্য ঃ পীরকে খোদা আখ্যায়িতকারী ফকীরগণ ফানা ফিল্লাহর অজুহাত দেখিয়ে পীর ও খোদার মধ্যে পার্থক্য না থাকার কথা বলে থাকেন। তারা মানসূর হাল্লাজ প্রমুখ মজযূবের জযবার হালাতে উক্ত কিছু বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়ে মতলব উদ্ধারের চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু প্রথমতঃ কথা হল ফানা ফিল্লাহর অর্থ সবকিছু আল্লাহ হয়ে যাওয়া নয় বরং সবকিছু আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া। সবকিছু আল্লাহ হয়ে যাওয়া এবং সবকিছু আল্লাহর জন্য হয়ে যাওয়া- এ দুটোর মধ্যে বহু ব্যবধান। দ্বিতীয়তঃ কোন মাজযূবের জযবার হালাতের কোন কথা দলীল নয়। দলীল হল কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (সা.)।

৫. সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের দর্শন ঃ

"বাংলার বাউল দর্শন" গ্রন্থে বলা হয়েছে- বাউল ধর্মের লক্ষ্য হল সর্বধর্মের সার সমন্বয় সাধন। সর্ব ধর্মের মূল লক্ষ্য আত্মার মুক্তি। আত্মার মুক্তি বা মোক্ষলাভের মূল বাণীসমূহ ও মতাদর্শের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাউল মতবাদ।

এই সর্বধর্ম সমন্বয় দর্শনের কারণেই বাউলগণ একদিকে খোদা রাসূলে বিশ্বাসের কথাও বলেন আবার রাম, নারয়ণ প্রমুখকে ঈশ্বর বা ঈশ্বরের অবতার হিসেবেও স্বীকার করেন। একই কারণে স্পষ্টতঃ মুসলমানদের পরিভাষায় আল্লাহ ও রাসূলের পরিচয় প্রদান ও আল্লাহকে সন্ধানের সোজা ইসলামী তরীকা থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন্ন পথ অবলম্বন করেন। এই একই কারণে বাউল রচিত সঙ্গীত বা গানে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মের মতবাদই প্রাধান্য পেতে থাকে।[১৫৫] "বাংলার বাউল দর্শন" গ্রন্থে বলা হয়েছঃ হিন্দু বাউল যেমন সূফী ভাবধারাকে মেনে নেয়, তেমনি হিন্দু বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব মতবাদকেও মুসলমান জাতির বাউল তথা ফকীর, দরবেশ প্রভৃতি সম্প্রদায় এড়িয়ে থাকেনি।

---

[১৫৫] বাংলার বাউল দর্শন, মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর-১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১৯১-১৯২॥

www.waytojannah.com

আল্লাহর নিকট ইসলাম ব্যতীত অন্য কেন ধর্ম গ্রহণযোগ্য নয়। ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ –

অর্থাৎ, ইসলাম ব্যতীত যে অন্য ধর্ম সন্ধান করবে, আদৌ তার থেকে তা কবুল করা হবে না এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান ঃ ৮৫]

অতএব, সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা একটি কুফরী মতবাদ। আকবরের দ্বীনে ইলাহী এবং এনায়েতপুরী ও মাইজভাণ্ডারী প্রমুখের মতবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. ওহী ভিত্তিক কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থাকে অস্বীকার ঃ

বাউলরা ঐশী শাস্ত্র বা জিব্রাইল মারফত কোন নবীর উপর প্রত্যাদিষ্ট শাস্ত্রভিত্তিক কোন ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা মানে না। কারণ এ সবের ভিত্তি হল চেতনা। বাউলরা সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও দল চেতনা স্বীকার করে না। তারা দেশ জাত-বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে কেবল মানুষকে জানতে, মানতে ও শ্রদ্ধা জানাতে চায়। মানুষের ভিতর মনের মানুষকে খুঁজে পেতে চায়।[১৫৬]

বাউলগণ তাদের কথিত সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রচেষ্টা থেকেই ওহী ভিত্তিক ধর্মকে অস্বীকার করেছে। এরূপ আকীদা-বিশ্বাস সন্দেহাতীত ভাবেই কুফ্‌রী।

৭. সংসার ত্যাগ ঃ

বাউলগণ সংসার বিরাগী হয়ে থাকেন। নিষ্ক্রিয়তা, জীবন-বিমুখতা ও আত্মসন্ধানের মাধ্যমে তাদের কথিত "মনের মানুষ"- কে সন্ধানই তাদের প্রধান লক্ষ্য। ইসলাম এরূপ বৈরাগ্যকে সমর্থন করে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে ঃ

ان الرهبانية لم تكتب علينا– (رواه احمد وابن حبان)

---

[১৫৬] বাংলার বাউল দর্শন, মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী, ডিসেম্বর, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ১৯৫ ॥

অর্থাৎ, আমাদেরকে সন্ন্যাসবাদের বিধান দেয়া হয়নি।

অতএব ইসলামে কোন সন্ন্যাসবাদ নেই। বরং ইবাদতও করতে হবে, সেই সাথে সাথে ঘর সংসার এবং সমাজের সাথে সম্পক সামঞ্জস্যও রাখতে হবে। আল্লাহকে পাওয়ার জন্য মেহনত-সাধনাও করতে হবে, আবার বিবি বাচ্চাদের খোঁজ-খবরও রাখতে হবে, তাদের ব্যাপারে ইসলাম যে দায়িত্ব অর্পন করেছে তাও পালন করতে হবে।

৮. সঙ্গীত সাধনা ঃ

সঙ্গীত বাউলদের সাধনার প্রধান অঙ্গ। বাউলদের গানগুলো "মারফতী" বা "মুর্শিদী" গান নামে অভিহিত হয়। উত্তর বঙ্গে 'বাউল গান' সাধারণতঃ 'দেহ তত্ত্বের গান" নামে এবং পশ্চিম বঙ্গে 'বাউল গান' নামে পরিচিত। এসব গানের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব[১৫৭] প্রভৃতি সব ধর্মের মতবাদই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কারণ তারা নির্দিষ্ট কোন ধর্মের অনুসারী নয় বরং তারা সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রবক্তা।

বাউলদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাত ব্যক্তি লালন (ফকির) শাহ্ তার লালন গীতের জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। অন্যান্য প্রসিদ্ধ বাউল কবিদের মধ্যে ছিলেন উত্তর বঙ্গের গঙ্গারাম, জগাকৈবর্ত পদ্মলোচন, শিখা ভূইমালী, কাঙ্গালী ও সিরাজসাঁই, সিলেটের মুনীরুদ্দীন ফকীর ও কুষ্টিয়া কুমারখালীর হরিণাথ মজুমদার (কাঙ্গাল হরিণাথ)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বাউলের রীতি অনুসরণ করে বহু গান লিখেছেন।

উল্লেখ্য উপরোক্ত দর্শনসমূহ ছাড়াও বাউলদের 'প্রেমতত্ত্ব', 'রূপ-স্বরূপ তত্ত্ব' আত্মিক-বিবর্তনবাদ' প্রভৃতি দর্শন রয়েছে।[১৫৮]

---

[১৫৭] বৈষ্ণব ঃ হিন্দু দেবতা বিষ্ণুব উপাসকগণ বৈষ্ণব নামে পরিচিত। ৭ম শতাব্দিতে রামানুজ দাক্ষিণাত্যে হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথা ও কঠোরতা থেকে মুক্ত এই বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করেন। ১৪শ শতাব্দির রামানন্দ এর রূপায়ন করেন। ১৬শ শতাব্দিতে চৈতন্যদেব বঙ্গদেশে এই ধর্মের বিস্তৃতি ঘটান।

[১৫৮] এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য দ্রষ্টব্য বাংলার বাউল দর্শন, লেখকঃ মোঃ সোলায়মান আলী সরকার, প্রকাশনায় বাংলা একাডেমী।

www.waytojannah.com

"সর্বেশ্বরবাদ/সর্বখোদাবাদ

(وحدة الوجود /Pantheism)

"সর্বেশ্বরবাদ"[১৫৯] বা "সর্বখোদাবাদ" বলতে বোঝায় 'সবকিছুই খোদা'- এই মতবাদ।[১৬০] ইংরেজীতে একে বলা হয় Pantheism (প্যান্থিইজম Pan=all (সব) theo=God [ঈশ্বর])। আর আরবীতে বলা হয় *وحدة الوجود* ওয়াহ্দাতুল উজূদ)। কিংবা বলা যায় এটি এমন এক মতবাদ যাতে সমগ্র মহাবিশ্বেই খোদা- এই মত পোষণ করা হয়। এ মতানুসারে স্রষ্টার বাইরে সৃষ্টির অস্তিত্ব থাকাকে অস্বীকার করা হয় এবং বলা হয় তিনিই (আল্লাহ্ই) সবকিছু। এ মতবাদে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মাঝে ঐক্য প্রকাশ করা হয় এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্বে অভেদত্ব প্রকাশ করা হয় বিধায় একে বলা হয় *وحدة الوجود*। আরবী একথাটির অর্থ হল অস্তিত্বের ঐক্য। সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় "তাওহীদ" "আইনিয়্যাত" এবং "মাজহারিয়্যাত" ইত্যাদিও এ মাসআলারই বিভিন্ন শিরোনাম।

মুসলিম মনীষীদের মধ্যে সর্বপ্রথম শায়খে আকবার ইব্নুল আরাবী এ মতবাদটি উদ্ভাবন করেন এবং তার অনুসারীগণ এটির প্রচার প্রসার ঘটান।[১৬১] ইব্নুল আরাবী এই মতবাদটি ব্যক্ত করতে যেয়ে বলেন ঃ وجود عين وجود المخلوقات الخالق অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টির অস্তিত্ব হুবহু আল্লাহর অস্তিত্ব। এখানে তিনি *عينيت* বা হুবহুতা বলে এই *وحدة الوجود* তথা স্রষ্টা ও সৃষ্টির অস্তিত্বের ঐক্য ও অভেদতত্বকেই বুঝিয়েছেন। ফারসী কবি ফরীদুদ্দীন আত্তার, সাদরুদ্দীন, নাবলূসী প্রমুখ তাদের লিখনীতে ইব্নুল আরাবীর এই *وحدة الوجود* মতবাদটি তুলে ধরেছেন এবং ব্যাখ্যা করেছেন। নাবলূসী এর ব্যাখ্যা করে করে বলেন- আল্লাহ্ই একমাত্র অস্তিত্ববান সত্তা, এই দৃষ্টিকোন থেকে যে, তিনি সার্বিক-সমগ্র (*كلى*) অন্যের দ্বারা তিনি অস্তিত্ববান (*قائم بالغير*)নন বরং তিনি স্বকীয় সত্তায় অস্তিত্ববান (*قائم بالذات*)। নাবলূসী এই *وحدة الوجود* -এর আরোহাকে প্রদত্ত

---

[১৫৯] "সর্বেশ্বরবাদ" শব্দটি সম্ভবতঃ হিন্দুদের মধ্যে যারা অদ্বৈতবাদ- এর সমান্তরাল হিসেবে সর্বেশ্বরবাদকে ব্যবহার করেন, তাদের সৃষ্টি। নতুবা মুসলমান ঈশ্বর শব্দকে খোদা ও আল্লাহ শব্দের সমান্তরালে ব্যবহার করেন না। তারা وحدة الوجود - এর প্রতি পরিভাষা হিসেবে "সর্বখোদাবাদ" শব্দ ব্যবহার করতে পারেন।

[১৬০] ইংরেজীতে বলা হয় ঃ The doctrine that the whole universe is good ঃ

[১৬১] অমুসলিমদের মধ্যে এখেন্সের দার্শনিক জেনো কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত স্টোয়িক দর্শনে সর্বদেবত্ববাদ তথা Patheism ছিল বলে জানা যায়। দ্রঃ বাংলা একাডেমী, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত "গ্রিক দর্শন প্রজ্ঞা ও প্রসার" মেঃ ১৯৯৪ সংস্করণ, পৃঃ ১৫৩ ঃ

www.waytojannah.com

কালিমার ব্যাখ্যাকেই বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা বলে অভিহিত করেছেন। তবে আহ্‌লুস সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের উলামায়ে কেরাম তার অভিমতকে মেনে নেননি।

এই পরিভাষায় পাশাপাশি হযরত মুজাদ্দিদ আলফে ছানী (রহ.) আর একটি পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। সেটিহল وحدة الشهود (ওয়াহ্‌াতুশ শুহূদ)। এর অর্থ হল সমস্ত অস্তিত্ববান জিনিসের মধ্যে শুহুদ তথা দৃষ্টিপাতা শুধু একটি সত্তার প্রতি।

এই وحدة الوجود (ওয়াহ্‌দাতুল উজূদ) কথাটার সঠিক সম্পর্কে মুহাক্কিক উলামায়ে কেরাম বলেছে ঃ এর দ্বারা প্রকৃত ও শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্যে নয়। বরং এটা হল এক ধরনের রূপক কথা। রূপকভাবে আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বের পূর্ণাঙ্গতার বিপরীতে অন্যান্য সমস্ত বস্তুর অস্তিত্বকে নেতিবাচ্যতার পর্যায়ে ধরে নেয়া হয়েছে। احسن الفتاوى গ্রন্থে বলা হয়েছে- কেননা আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ এবং তাঁর বিপরীতে অন্যান্য সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব এতই অপূর্ণ যে, তা প্রায় নেতিবাচ্যতার পর্যায়ভুক্ত। সাধারণ বাগধারায় পূর্ণাঙ্গের বিপরীতে অপূর্ণাঙ্গকে অস্তিত্বহীন বলা হয়। যেমন ঃ কোন বড় জবরদস্ত আল্লামার বিপরীতে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তিকে অথবা প্রসিদ্ধ বীর পাহলোয়ানের বিপরীতে সাধারণ ব্যক্তিকে বলা হয়- 'এতো তার সামনে কিছুই নয়'। অথচ সাধারণ ব্যক্তিটি অস্তিত্বহীন তা নয় বরং তার স্বতন্ত্র সত্তা ও গুণাবলী বিদ্যমান। কিন্তু পূর্ণাঙ্গের বিপরীতে তাকে 'নাস্তি' সাব্যস্ত করা হয়। কিংবা যেমন কোন সম্রাটের দরবারে কেউ আবেদন পেশ করলে সম্রাট তাকে কোন ছোট অধীনস্ত শাসকদের শরণাপন্ন হতে পরামর্শ দেন। আর লোকটি প্রতি উত্তরে বলে, হুজুর! আপনিই সবকিছু। তখন এর অর্থ এই হয় না যে, সমস্ত অধিনস্ত শাসক সম্রাটের সাথে একাকার এবং অন্যান্য শাসকদের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নেই, বরং "আপনিই সবকিছু" কথাটার উদ্দেশ্য হল- আপনার সামনে সমস্ত অধীনস্ত শাসক নাস্তির পর্যায়। অনুরূপভাবে (রূপক অর্থে) সুফিয়ায়ে কিরাম আল্লহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ অস্তিত্বের সামনে সমস্ত মাখলূকের অস্তিত্বকে 'নেই' সাব্যস্ত করেন। হযরত শেখ সাদী (রহ.) দু'টি উদাহরণের মধ্যে এর খুব সুন্দর বিবরণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন-

১ নং উদাহরণ ঃ তুমিদেখে থাকবে মাঠে-ময়দানে রাতের বেলায় চেরাগের ন্যায় জোনাকী পোকা জ্বলে। একজন জিজ্ঞেস করল, হে রাতকে আলোকোজ্জ্বলকারী জোনাকী পোকা! কি ব্যাপার ? তোমাকে দিনের বেলায় দেখা যায় না কেন? জোনাকী উত্তর দিল- আমি তো দিবারাত্র মাঠে-ময়দানেই থাকি। মাঠ-ময়দান ছাড়া কোথাও থাকি না, তবে সূর্যের সামনে আমি প্রকাশিত হতে পারি না।' (অর্থাৎ সূর্যের সামনে আমি যেন অস্তিত্বহীন, তাই আমাকে দেখা যায় না।)

২নং উদাহরণ ঃ বৈশাখে এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি সমুদ্রের অভ্যন্তরে পড়ে সমুদ্রের বিশালতা দেখে লজ্জিত হয়ে যায়। বৃষ্টির ফোটাটি তখন বলে, "যেখানে সমুদ্র সেখানে আমি এক ফোঁটা বৃষ্টি আর কি? বাস্তবে যদি এর অস্তিত্ব থাকে, তবে আমি তো অস্তিত্বহীন।

এরূপ রূপক অর্থেই যত কিছু অস্তিত্ববান, আল্লাহর অস্তিত্বের সামনে তাকে 'অস্তিত্বহীন' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। আর এটারই পরিভাষা হল এই وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ)

অনুরূপ عينيت (আইনিয়্যাত) শব্দটিও সুফিয়ায়ে কেরামের পরিভাষায় রূপকভাবে মুখাপেক্ষিতার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ অর্থে সমস্ত মাখলূক হুবহু স্রষ্টা। অর্থাৎ, তাঁর মুখাপেক্ষী। তবে সুফিয়ায়ে কেরাম "আইনিয়্যাত" শব্দটি ব্যবহারের জন্য এই শর্তারোপ করেছেন যে, এই মুখাপেক্ষিতার জ্ঞান (মা'রেফত) ও যেন থাকে। সেমতে শুধুমাত্র আরিফ ব্যাক্তির পক্ষেই এ শব্দটি ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছেন। কোন কোন সময় এ শব্দটি ব্যবহারের জন্য অতিরিক্ত আরেকটি শর্তও সংযুক্ত করেছেন যে, এই শব্দটি ব্যবহারকারী ব্যক্তির মা'রেফাতে এ পরিমাণ বিভোরতা থাকতে হবে যে, সমস্ত মাখলূক এমনকি তার নিজের সত্তার দিকেও তার দৃষ্টি থাকবে না। এ অর্থেই আরিফ রূমী (রহ.) বলেছেন-

ঐ এক জনের চেহারা হল প্রেমাস্পদমুখী, আর এই একজনের চেহারাই হল স্বয়ং প্রেমাস্পদের চেহারা।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) তাঁর فيصلته وحدة الوجود والشهود গ্রন্থে বলেন- "ওয়াহ্দাতুল উজূদ" ও "ওয়াহ্দাতুশ শুহূদ" পরিভাষা দু'টি দুই ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। **(এক)** কখনও এ পরিভাষা দু'টি আল্লাহ্র পথে সায়েরকারী তথা সালেকের দু'টি মাকাম বা অবস্থা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয় এবং বলা হয় এই সালেকের মাকামই ওয়াহ্দাতুল উজূদ এবং ঐ সালেকের মাকাম হল ওয়াহ্দাতুশ শুহুদ। এখানে 'ওয়াহ্দাতুল উজূদ' বলে বোঝানো হয় হাকীকত বা তত্ত্বজ্ঞানের সন্ধানে এমন মহা নিমগ্নতাকে, যা ভাল-মন্দ নির্ণয়ের ভিত্তি রূপ শরী'আত ও বিবেক বিবৃত পার্থক্য জ্ঞানকে রহিত করে দেয়। কোন কোন সালেক এই স্তরে নিপতিত হয়ে থাকেন, যতক্ষণ না আল্লাহ তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। আর যদি সালেকের সমন্বয় ও পার্থক্য জ্ঞান বহাল থাকে তাহলে সে জানতে পারে সমস্ত কিছু কোন এক দৃষ্টিভংগিতে এক হলেও অন্য বহু প্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন, তাহলে সালেকের এই স্তরকে বলা হয় 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ'। এই দ্বিতীয় মাকামটি অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ও নির্ঝঞ্ঝাট।

(দুই) কখনও কখনও এ পরিভাষা দু'টি বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান অর্জন প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয় থাকে। এই জ্ঞান অর্জন করতে যেয়ে অনিত্ব (قديم) ও নিত্ব (حادث)-এর মাঝে সম্বন্ধ নির্ণয়ের প্রশ্নে কেউ কেউ মনে করেছেন জগতের সবকিছুই আপতন বা অপ্রধান বিষয় (عرض /accident), যা আপনা আপনি স্বতন্ত্রভাবে পাওয়া যায় না বরং একটি সত্তায় কেন্দ্রিভূত হয়। যেমন মোম দিয়ে যদি মানুষ, ঘোড়া, গাধা ইত্যাদির আকৃতি বানানো হয়, তাহলে মোমের অস্তিত্ব ঐ সব আকৃতি ছাড়াও বিদ্যমান। আবার বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে অভিজ্ঞান অর্জন করতে যেয়ে কেউ কেউ মনে করেছেন গোটা জগত হল আল্লাহর নাম ও গুণাবলী (اسماء وصفات)-এর প্রতিবিম্ব, যা ঐ নাম ও গুণাবলীর বিপরীত নাস্তির আয়নায় প্রতিবিম্বিত। যেমন ক্ষমতার বিপরীত হল অক্ষমতা। এ ক্ষেত্রে অক্ষমতার আয়নায় ক্ষমতার আলো প্রতিবিম্বিত হয়। আল্লাহর সমস্ত গুণাবলীর বিষয়টি এমন। অস্তিত্বের বিষয়টিও অনুরূপ।[১৬২] যাহোক প্রথমোক্ত শ্রেণীর মতবাদ হল 'ওয়াহদাতুল উজূদ' আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মতবাদটি হল 'ওয়াহদাতুশ শুহুদ'।

এই হল وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ)- এর মুহাক্কিক উলামা ও মাশায়েখে কেরামকৃত সঠিক ব্যাখ্যা। এর বিপরীত কিছু কিছু অজ্ঞ সূফী ও তাদের অনুসারীগণ وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ) কথাটিকে প্রকৃত ও আভিধানিক অর্থে গ্রহণ করে কোন কোন পীর সাহেবকে খোদার স্তরে পৌঁছে দিয়েছেন এবং পীর ও সূফীকে খোদায়ী গুণে গুণান্বিত বলে ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছেন। যেমন ভাইজভাণ্ডারী, এনায়েতপুরী ও আটরশি প্রমুখ পীরদের আকীদা-বিশ্বাস বর্ণনা প্রসঙ্গে কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে।

জাহেল সূফী ও তথাকথিত দার্শনিকদের ফিতনা থেকে উম্মতকে হেফাযত করার জন্য আহলে এরশাদ তথা মাশায়েখে কেরাম وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ)-এর পরিভাষা ব্যবহারের পরিবর্তে وحدة الشهود পরিভাষা ব্যবহার করাকে নিরাপদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে ফিতনার আশংকা নেই। কারণ, এতে অন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়নি। বরং এর অর্থ হল সমস্ত অস্তিত্ববান জিনিসের মধ্যে শুহুদ তথা দৃষ্টিপাত শুধু একটি সত্তার প্রতি নিবদ্ধ থাকবে।

---

[১৬২] অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য সবকিছুর অস্তিত্ব হল নাস্তির পর্যায়ভূক্ত। সেই নাস্তির আয়নায় আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়ে থাকে। ফলে দৃষ্টিপাত কালে একই অস্তিত্বের প্রতিই দৃষ্টিপাত হয়ে থাকে॥

www.waytojannah.com

কোন কোন ইংরেজী শিক্ষিত মুসলিম দর্শন শাস্ত্রবিদ وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ)- এর মুহাক্কিক উলামায়ে কেরামকৃত সঠিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে এরূপ মন্তব্যও করেছেন যে, একেশ্বরবাদ নয় বরং সর্বেশ্বরবাদ (তথা ওয়াহ্দাতুল উজূদ) ই হল ইসলামের সূফী দর্শন।[১৬৩] এ ধরনের লোকেরা সর্বেশ্বরবাদকে ইসলামের একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক মনে করেন না। কিন্তু সর্বেশ্বরবাদ কোনক্রমেই কোনক্রমেই একত্ববাদ নয়। কারণ ঃ

১. একত্ববাদে স্রষ্টার অস্তিত্বকে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে দেখা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে অন্য সবকিছুর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। অথচ মানুষ ইত্যাদি অনেক কিছুরই অস্তিত্ব পঞ্চইন্দ্রিয় দ্বারা প্রমাণিত।

২. একত্ববাদে স্রষ্টাকে সৃষ্টির অস্তিত্ব থেকে আলাদা করে দেখা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদে খোদা ছাড়া অন্য কিছুই নেই। কিন্তু স্রষ্টা আর সৃষ্টি কখনও এক হতে পারে না। অন্যথায়, সৃষ্টিকে স্রষ্টা বলতে হয়। মানুষকেও খোদা বলতে হয়। তাহলে আমি আপনি কি? আমি আপনি কি খোদা? আমরাতো অসহায়, আল্লাহ্তো আমাদের মত অসহায় হতে পারেন না।

৩. একত্ববাদ স্রষ্টার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। পক্ষান্তরে সর্বেশ্বরবাদের অন্য সবকিছুর স্বতন্ত্র অস্বীকার করা হয় এবং মহাবিশ্বের সবকিছুকে খোদার সঙ্গে লীন করে দেয়া হয়। ফলে খোদা হয়ে যান নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। আর নৈর্ব্যক্তিক সত্তার স্বতন্ত্র কোন ইচ্ছা, প্রজ্ঞা, প্রেম ইত্যাদি কিছুই থাকে না। অথচ ইসলাম ইচ্ছা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি সবকিছুর ক্ষেত্রে খোদার একচ্ছত্রতা প্রমাণিত করেছে।

অতএব সর্বেশ্বরবাদ কোনক্রমেই ইসলামের মতবাদ হতে পারে না। সুফিয়ায়ে কেরাম যারা وحدة الوجود (ওয়াহ্দাতুল উজূদ) পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, তারা সেই শুদ্ধ ও রূপক অর্থেই তা করেছেন, যার ব্যাখ্যা আমরা পূর্বে প্রদান করেছি।

কেই কেউ وحدة الوجود সর্বেশ্বরবাদ ও অদ্বৈতবাদ দেখে ভ্রান্তি হয়ে থাকবার সম্ভাবনা রয়েছে। কোন কোন হিন্দু মনে করে 'বিশ্ব ব্রহ্ম'। এ রকমের মতবাদে বলা হয় "অদ্বৈতবাদ"। যদিও হিন্দু ধর্মে 'ব্রহ্ম'ই যে আসল প্রভু কিনা তা স্পষ্ট নয়। 'বিষ্ণু', 'মহেশ্বর' দেবতাও ব্রহ্ম-র প্রতিদ্বন্দ্বী। অতএব وحدة الوجود ও অদ্বৈতবাদ এক কথা নয়।

---

[১৬৩] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম কর্তৃক রচিত "মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি" নামক গ্রন্থে এমন ধারনা পেশ করা হয়েছে।

এন. জি. ও

এনজিও (N.G. O) কথাটি একটি দীর্ঘ কথার শব্দ সংক্ষেপ। পুরো কথাটি হল Non government Organization অর্থাৎ, বেসরকারী সংস্থা। সংক্ষেপে N.G. O (এন.জি. ও) বলা হয়।

শাব্দিক অর্থ হিসেবে সব ধরনের বেসরকারী সংস্থাগুলোকেই এন. জি. ও বলা যায়। কিন্তু সাংবিধানিক অর্থে এনজিও বলা হয়- মুনাফার উদ্দেশ্য ছাড়া শুধু সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত সংস্থাকে। অর্থাৎ, যে সংস্থাগুলো বেসরকারীভাবে অর্থ সংগ্রহ করতঃ তা নিরক্ষরতা দুরীকরণ, স্ব-কর্মসংস্থান, শিশু ও মাতৃসেবা দান, সমাজ উন্নয়ন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেবা প্রদান ও ঋণ বিতরণ ইত্যাদি সেবামূলক কাজে ব্যয় করে।

এ সকল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই মূলতঃ বাংলাদেশ সরকার অন্যান্য দেশের মত দেশী-বিদেশী এনজিওগুলোকে এদেশে কাজ করার অনুমতি প্রদান করেছে। কিন্তু অনুমোদন লাভের পর এনজিওগুলো প্রতিশ্রুতি মোতাবেক শুধু সেবামূলক কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তারা (বিশেষভাবে খৃষ্টান এন.জি.ওগুলো) সবার নামে এদেশে সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষের কৃষ্টি কালচার, রীতিনীতি ও ধর্মীয় অনুভূতিতে চরমভাবে আঘাত হানছে। গ্রাম বাংলার পারিবারিক ও সমাজ ব্যবস্থাকে মারাত্মকভাবে বিনষ্ট করছে, শুধু এতটুকুই নয়, এমনকি জাতীয় অর্থনীতি এবং রাজনীতিতেও হস্তক্ষেপ শুরু করেছে।

বিভিন্ন তথ্য সূত্রে পাওয়া যায় বর্তমাতে রেজিষ্ট্রিকৃত ও অরেজিষ্ট্রিকৃত দেশে বিদেশী ইসলামী ও অনৈসলামিক সব মিলে ত্রিশ হাজার এন. জি.ও বাংলাদেশে কার্যরত রয়েছে। তবে এ মধ্যে ২২/১১/০৩ইং সন পর্যন্ত রেজিষ্ট্রিকৃত বিদেশী এন. জি. ও-র সংখ্যা ১৮০টি আর দেশী এন.জি ও-র সংখ্যা ১৬৪৩টি। সর্বমোট ১৮২৩টি।

www.waytojannah.com

বিদেশী	দেশী
১. কেয়ার (CARE)	১. ব্রাক (BRAC)
২. আ.ডি. আর এস (RDRS)	২. প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন
৩. এম.সি.সি(MCC)	কেন্দ্র
৪. এডরা (ADRA)	৩. কারিতাস
৫. কনসার্ন (CONCERN)	৪. সি. সি.ডি. বি
৬. ওয়ালর্ল্ড ভিশন অব বাংলাদেশ	৫. নিজেরা করি
৭. সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড (ইউ কে)	৬. গণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র
৮. সেভ দি চিলড্রেন ফান্ড (ইউএসএ)	৭. হীড বাংলাদেশ
৯. ডিয়া কোনিয়া	৮. কুমিল্লা প্রশিকা
১০. অক্সফাম (OXFAM)	৯. আশা
১১. এ্যাকশ এইড	১০. ডি এইচ এস এস
১২. সুইডিশ ফ্রি মিশন	১১. বি.এ. ভি এস
১৩. আইডিয়াস ইন্টারন্যাশনাল	১২. এডার
১৪. সাউথ এশিয়া পার্টনারশীপ	১৩. ইউসেফ
১৫. ইউ, এস, সি, সি বি,	১৪. সপ্তগ্রাম নারী স্বনির্ভর
১৬. ফ্যামিলিজি ফর চিলড্রেন	১৫. বাংলাদেশ পরিবার
১৭. অস্টেলিয়ান ব্যাপটিস্ট মিশনারী	পরিকল্পনা সমিতি
সোসাইটি	১৬. ওয়াই, এস. সি এ
১৮. ই. ডি, এস	১৭. বাঁচতে শেখা
১৯. টি, ডি, এইচ (T.D.H) সুইজারল্যান্ড	১৮. উন্নয়ন সহযোগিতা টীম
২০. রাড্ডা বারনেন।	১৯. সি. ডি. এস

এছাড়া উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ইসলামী সেবা সংস্থাও রয়েছে তবে এখানে পাশ্চাত্য ভাবধারার বিদেশী এনজিও এবং পাশ্চাত্যের মদদ পুষ্ট দেশীয় এনজিও যেগুলি সেবার ছদ্মবরণে অর্থনৈতিক শোষণ, ধর্মান্তরিত করণ এবং সমাজ বিনষ্টকরণের মত নেতিবাচক কাজেও লিপ্ত শুধু সে সকল এনজিগুলো সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোকপাত করা হচ্ছে।

*** এনজিওদের আগমনের পেক্ষাপট ঃ**

১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধের ফলে গোটাদেশ একটি ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়। নূন্যতম

মানবিক চাহিদা সামগ্রী তথা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসার চরম সংকট দেখা দেয়। অভাব-অনটনে চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে যায়। দেশের এহেন সংকটপূর্ণ মুহূর্তে মানুষের দরিদ্রতা ও দুরাবস্থার অজুহাতে ধূর্ত ও ফন্দিবাজ এনজিওগুলো গায়ে সেবার আকর্ষণীয় লেবেল এঁটে বাংলার বুকে আগমন করে।

এমনিভাবে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের সময়, ১৯৮৮ সালে সর্বনাশা বন্যার সময়, ১৯৯১ সালের ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ের সময়, ১৯৯৮ সালের দীর্ঘস্থায়ী সর্বগ্রাসী বন্যার সময় তথা দেশের চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তগুলোতে এনজিওদের সরব আগমন ঘটেছে। কিন্তু আগমনের কিছুদিন যেতে না যেতেই তাদের আসল স্বরূপ জাতির উলামা ও সচেতন মহলের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। তখন থেকেই উলামায়ে কেরাম এবং সচেতন মহল দেশের সরকার ও জাতিকে এনজিওদের অপতৎপরতার ব্যাপারে অবগত করে আসছেন।

বর্তমানে বাংলাদেশে কার্যরত ত্রিশ হাজার এনজিও প্রায় সবগুলো খৃষ্টান বিশ্ব ও খৃষ্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে। এ হিসেবে বলতে গেলে খৃষ্টান মিশনারীগণ ১৫১৭ সালে প্রাকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের লীলা ভূমি সুজলা সুফলা শষ্য শ্যামলা এ বাংলার বুকে সর্বপ্রথম আগমন করে। এরএকশত তেত্রিশ বছর পর তারা তাদের স্বজাতি খৃষ্টান বণিকদেরকে এদেশে নিয়ে আসে। এর পর তারা দুদলে মিলে বাংলার হিন্দু, মুসলমানের মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টিসহ বিভিন্ন ধরনের শোষণ ও লুণ্ঠন চালায়। ১৭৫৭ সালে এসে আমাদের সার্বভৌম সত্ত্বাকে পদদলিত করে। দীর্ঘদিন দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ থাকার পর একটি বৃহৎ মুসলিম জনগোষ্ঠি ১৯৪৭ সালে মুসলমানকে খৃষ্টান বানানোর দূরভিসন্ধি নিয়ে এনজিওগের হাতে হাত কাধে কাধ মিলিয়ে আবার এদেশে আগমন করে। তাই সার্বিক দিক বিবেচনায় দেখা যায় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে এনজিওদের গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। শ্লোগান শুধু ভিন্ন, কিন্তু অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন।

নিম্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদেরঅপতৎপরতার সংক্ষিপ্ত চিত্র তুলে ধরা হল ঃ

সামাজিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা ঃ

দীর্ঘদিন ইসলামী অনুশাসনের চলে আসা আমাদের গ্রাম বাংলার পারিবারিক এবং দাম্পত্য জীবন এনজিওদের দূরভিসন্ধি তথা খৃষ্টান বানানোর ক্ষেত্রে প্রধান অন্ত

www.waytojannah.com

রায়। তাই এনজিওগণ আমাদের পারিবারিক ব্যবস্থা এবং দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট করার জন্য আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছে। লক্ষ লক্ষ পুরুষ বেকার ও কর্মহীন থাকা সত্ত্বেও নারী জাতিকে সাবলম্বী করার ভাওতা দিয়ে আমাদের কোমল মতি নারীদেরকে কর্মসংস্থানের জন্য স্বামী ঘরের আরাম থেকে বের করে মাঠে গঞ্জে বাজারে হাড় ভাঙ্গা খাটুনির কাজে লাগাচ্ছে। তাও আবার অল্প মজুরীর কর্মে। আবার অনেক এনজিও সংস্থা আমাদের অবলা রমণীদেরকে স্বেত চামড়ার এনজিও কর্মকর্তাদের সেবা ও মনতুষ্টির মত হীন কাজে ব্যবহার করছে। এভাবে এনজিওগুলো মহিলাদেরকে স্বামী থেকে দুরে সরিয়ে দিচ্ছে অনেক এলাকাতে আবার এনজিওদের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে স্ত্রীগণ স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অফিসে গিয়ে এনজিও কর্মর্কতাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও ফস্টি নষ্টি করে। এতে স্বামী স্ত্রীর মাঝে অন্তঃকলহ সৃষ্টি হয়। উপরন্তু এনজিও সংস্থাগুলো মহিলাদেরকে 'কিসের বর কিসের ঘর' 'ঘরের ভিতর থাকবনা স্বামীর কথা মানব না', 'আমার মন আমার দেহ, যাকে খুশি তাকে দেব'- এরূপ বিভিন্ন উদ্ধত ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলা উদ্দীপক শ্লোগান শিক্ষা দিয়ে স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন করছে এবং অবাধ যৌনাচারিতার দিকে নারী সমাজকে অগ্রসর করছে। তারা 'স্বামী স্ত্রীকে লাঠি দিয়ে প্রহার করছে' এ ধরনের উদ্ভট চিত্র সম্বলিত পোষ্টার, ফেস্টুন দেখিয়ে নারী নির্যাতনের কল্প-কাহিনী শুনিয়ে মহিলাদেরকে স্বামীর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছে। এর অনিবার্য পরিণাম স্বরূপ বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে অসংখ্য সুখের সংসার ভেঙ্গে ছার খার হয়ে যাচ্ছে। এভাবে আমাদের সামাজিক ভারসাম্যতা মারাত্মকভাবে বিনষ্ট হচ্ছে। এদিকে এনজিওগণ তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদেরকে 'ফ্রি লিগেল এইড' দিয়ে থাকেন। যার ফলে তারা স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াকে ভয় পাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে এ সকল নারীরা খৃষ্টানদের খপ্পরে পড়ে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছে। অনেকে নিজেদেরকে পশ্চিমা জীবন ধারায় পরিচালিত করছে।

*** অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎরতা ঃ**

এনজিও সংস্থাগুলো অর্থনৈতি সাহায্যের নামে অর্থনৈতিক শোষণ চালাচ্ছে। তারা ২০% থেকে ৬০% কোন কোন সংস্থা ২২৬% ও ২০০% এরূপ উচ্চ সুদের হারে অর্থ লগ্নীকরে। এ সুদ তারা দৈনিক ও সাপ্তাহিক উশুল পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করে। আর এই সর্বনাশা ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে অনেক পরিবার ভিটে-বাড়ী ছাড়া হয়েছে। অনেকে এনজিওদের অমানবিক নির্যাতনের শিকার হয়ে রাগে ক্ষোভে বিষ পানে আত্মহত্যা করেছে। এনজিওদের চাপে নিরুপায় হয়ে কোলের সন্তান

বিক্রি করে অজানার উদ্দেশ্যে পাড়ি জমিয়েছে- এমন লোকের সংখ্যাও কম নয়। এভাবে আমাদের সমাজ জীবনে চরম বিপর্যয় নেমে এসেছে। তাই বিভিন্ন সমীক্ষার রিপোর্ট অনুসারে দারিদ্র বিমোচনের পরিবর্তে এনজিওগুলোর কারণে উল্টো দরিদ্রতা আরো সমাজকে চরমভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে।

*** রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এনজিওদের অপতৎপরতা ঃ**

এনজিওগুলো সাহায্য সহযোগিতার নামে অনুমোদন লাভ করে থাকে। কোন রূপ রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা গঠনতান্ত্রিকভাবে তাদের জন্য বিধিবদ্ধ নয়। কিন্তু বিদেশী খৃষ্টান মিশনারীদের দ্বারা পরিচালিত এনজিওগুলো শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এনজিওগুলো রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করে তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী প্রার্থীকে বে-আইনিভাবে প্রচুর অর্থ প্রদান করে এবং ভোট প্রদানের জন্য টার্গেট গ্রুপকে নির্দেশ দেয়। বলা বাহুল্য- এভাবে যথেষ্ট সংখ্যক এনজিও সমর্থক প্রার্থী বিভিন্ন সময় শীর্ষ স্থানীয় তিনটি দলের টিকিটে সংসদ সদস্য হয়েছেন। এছাড়াও বিদেশী এনজিওগুলো তৃণমূল পর্যায়ে শতকরা ৪৪ ভাগ গ্রামে তাদের সংগঠন কায়েম করেছে। উপজেলা নির্বাচনে তারা প্রকাশ্যে অংশগ্রহণ করছে। তারা ৪০০ প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। তার মাঝে ১০ জন চেয়ারম্যান নির্বাচিতও হয়েছেন। এছাড়াও এনজিও নিয়ন্ত্রিত ভূমিহীন সমিতির অনেক মহিলা ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বর নির্বাচিত হয়েছেন। এনজিওগুলো শুধু নির্বাচন কালেই সক্রিয় থাকে এমন নয়, বরং প্রত্যেকটি রাজনৈতিক ইস্যুতেই তারা কোন না কোনভাবে নগ্ন হস্তক্ষেপ করে থাকে। যা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌত্বের জন্য চরম হুমকী স্বরূপ।

*** ধর্মীয় ক্ষেত্রে ইনজিওদের অপতৎরতা ঃ**

এনজিগুলো অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ধর্মীয় ক্ষেত্রেও মারাত্মভাবে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। মুসলমানদেরকে খৃষ্টানধর্ম ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্যে তারা হরেক রকমের অপকৌশল অবলম্বন করছে। শিক্ষা প্রদানের নামে এনজিও পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে- তারা কোমলমতি শিশুদের মগজ ধোলাই করছে। 'ইসলাম', ও 'আল্লাহ' সম্পর্কে বিভ্রান্তির বীজ তাদের মনে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। এভাবে আমাদের আগামী প্রজন্মকে অঙ্কুরেই বিনাশ করে দিচ্ছে। এমনিভাবে এনজিও সংস্থাগুলো শক্তিশালী নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জোরেসোরে সারা বাংলায় ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে ন্যাক্কার জনক প্রপাগান্ডা ও তথ্য সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তারা

গ্রাম বাংলার সরল প্রাণ মুসলমান ভাইদের কাছে বলছে 'মুসলামন মানেই দরিদ্রতা আর খৃষ্টান মানেই ধনবান'। তারা মানুষকে ধর্ম বিমূখ ও ধর্মহীতা করার জন্য নানা কৌশলে শুক্রবারে নামাযসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামায না পড়ার জন্য উপদেশ প্রদান করে। তারা পর্দা ব্যবস্থার ঘোর বিরোধিতা করে, পর্দা অগ্রগতির অন্তরায় বলে মেয়েদের শিক্ষা দেয়। [দৈনিক ইনকিলাব]

তারা আরো বলে "মুহাম্মাদের চাইতে ঈসা বড়।" "মুহাম্মাদ (সা.)-এর শাফাআত করার অধিকার নাই।" "ইসলামের ইতিহাস হত্যা ও ধ্বংসের কাহিনী' ইত্যাদি।

এছাড়াও খৃষ্টান মিশনারী নেটওয়ার্ক ইসলামের ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাসের বিকৃত ব্যাখ্যা সম্বলিত বই-পত্র দেশের আনাচে-কানাচে বিনামূল্যে বিতরণ করছে। এসব পুস্তকের মুল বক্তব্য হল- "ইসলামের নবী শান্তির দূত নন বরং তিনি একজন যোদ্ধা। ইসলাম মানবতার মুক্তি দিতে পারে না। পরকালেরও কোন গ্যারান্টি দিতে পারে না। পক্ষান্তরে খৃষ্টধর্ম দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ বিধান করে।" এভাবে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোকা দিয়ে ও বিভ্রান্ত করে খৃষ্টান বানানোর সকল অপকৌশল অবলম্বন করছে। তাই অনেক স্বরলপ্রাণ নিষ্ঠাবান মুসলমানও ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়ে যাচ্ছেন।[১৬৪]

ধর্মীয় ক্ষেত্রে এনজিওদের অনাসৃষ্টির একটি উদাহরণ হল তারা "জজ মেজিস্ট্রেট থাকে ঘরে মোল্লা এখন বিচার করে"- এ ধরণের কটুক্তিমূলক চরম আপত্তিকর শ্লোগান সম্বলিত পোষ্টার, প্ল্যাকার্ড, ব্যানার দিয়ে মহিলাদেরকে আলেম সমাজের বিরুদ্ধে মাঠে নামিয়েছে। এভাবে এনজিওগুলো সমাজকে মারাত্মক সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দেয়ার মত চরম ধৃষ্টতা প্রদর্শন করছে। বাস্তব হল এনজিওদের কার্যক্রম গোটা দেশব্যাপী। "এক সমীক্ষায় দেখা যায় ২.৫৫ গ্রামে একটি করে এনজিও।" তাই তাদের দুস্কৃতি ও অপতৎপরতার পরিধিও অত্যন্ত ব্যাপক। যা এ অল্প পরিসরে লিখে শেষ করা সম্ভব নয়।[১৬৫]

---

[১৬৪] উল্লেখ্য খৃষ্টান এনজিও মিশনারীদের বিশ বছরের প্রচেষ্টায় ১৯৯২ সন পর্যন্ত খৃষ্টান জনসংখ্যা অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে পঞ্চাশ লাখে উন্নীত হয়েছে। তাদের টার্গেট চিল ২০০০ সাল নাগাদ জনসংখ্যা এক কোটিতে উন্নীত করা, যা আমাদের জন্য অত্যন্ত উদ্বেগ জনক।

[১৬৫] তথ্যসূত্র ঃ বাংলাদেশ এনজিও উপনিবেশবাদের দুর্ভেদ্য জালেঃ লেখক মুহাম্মদ নূরুযযামান ও এনজিদের ষড়যন্ত্রের কবলে বাংলাদেশ ঃ লেখক মুহাম্মদ এনামুল হক জালালাবাদী ॥

গান-বাদ্য প্রসঙ্গ

গানের সংজ্ঞা ঃ

গানের আরবী শব্দ হল- غناء - غناء শব্দটি আভিধানিকভাবে দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ

১. বড় আওয়াজ বা আ রবী লাহান, যে লাহানে কুরআন তেলাওয়াত করা হয় এবং আরবী কবিতা পাঠ করা হয়।

২. গান 'গান'- এর আভিধানিক অর্থ হল সঙ্গীত/ কণ্ঠ সঙ্গীত। আর পরিভাষায় গান বলা হয় এমন সঙ্গীতকে যা অন্তরে কামোদ্দীপনা জাগ্রত করে ও যৌন সুড়সুড়িমূলক আবেদন সৃষ্টি করে। এ কারণেই গানকে যেনার মন্ত্র বলে আখ্যায়িত করা হয়। আল্লামা তাহের পাটনী বলেন ঃ

العناء رقية الزنا- (مجمع بحار الانوار جـ/ع)

অর্থাৎ গান হল যেনার মন্ত্র।

তবে সাধারণত ঃ গান বাদ্যযন্ত্র সহকারে হয়ে থাকে বিধায় বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত সূর সঙ্গীতকে গান বলা হয়। যেমন বলা হয়েছে ঃ

সামা' বলা হয় বাদ্যযন্ত্রও ও বাঁশি বিহীন সূর সঙ্গীতকে, আর গান বলা হয় বাদ্যযন্ত্র সমন্বিত সূর সঙ্গীতকে।

কবিতা পাঠের শরঈ বিধান ঃ

খুশির অনুষ্ঠানে তিন শর্তে غناء তথা সূর করে কবিতা পাঠ সর্ব সম্মতিক্রমে জায়েয। শর্তত্রয় হল ঃ

১. কবিতা পাঠের সাথে دف ব্যতীত অন্য কোন বাদ্য যন্ত্র ব্যবহৃত হবে না।

২. কবিতার কথা ও বিষয়বস্তু অশালীন ও অশ্লিল না হতে হবে।

৩. কবিতাটি সঙ্গীতের সূরধারা (وزن موسبقى) মোতাবেক না হতে হবে। এ ছাড়া কবিতা আবৃত্তিকারী বেগানা নারী না হওয়ারও শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে।

গান ও বাদ্যের শরঈ বিধান ঃ

শরী'আতে গান-বাদ্য হারাম। গান হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের কোন মতবিরোধ নেই। দুররুল মা'আরিফ গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

আর পারিভাষিক অর্থে গান হারাম হওয়ার ব্যাপারে উলামাদের মাঝে কোন মতানৈক্য নেই। অবশ্য বাদ্যের ব্যাপারে সামান্য ব্যাখ্যা রয়েছে। বাদ্য তিন প্রকার-

১. ঐ সমস্ত বাদ্য যেগুলোকে ঘোষণা ইত্যাদির জন্য বানানো হয়েছে, যেগুলো দ্বারা আনন্দ-ফুর্তি, ক্রীড়া-কৌতুক উদ্দেশ্য নয়। যেমন ঃ دف ঘন্টা, نقاره /ডঙ্কা। এ সবের ব্যবহার জায়েয।

২. ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র যেগুলো আনন্দ-ফুর্তি, আমোদ-প্রমোদ ও ক্রীড়া-কৌতুকের উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে এবং সেগুলো ফাসেক ফুজ্জারদের شعار বা প্রতীক। যেমন ঃ সেতারা, হারমোনিয়াম, গিটার, সারিন্দা, একতারা, দোতারা ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহার সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।

৩. ঐ সকল বাদ্যযন্ত্র, যেগুলো আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া-কৌতুকের জন্য বানানো হয়েছে। তবে সেগুলো ফাসেক ফুজ্জারদের প্রতীক নয়। যেমন ঃ বড় ঢোল। এগুলোর ব্যাপারে ইমাম গাযালী (রহ.) এবং কতক সূফীয়ায়ে কেরাম বিভিন্ন শর্ত স্বাপেক্ষে অনুমতি দিয়েছেন। শর্তগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক) শুনানে ওয়ালা শ্মশ্রুবিহীন বালক না হতে হবে। অথবা গায়র মাহরাম নারী না হতে হবে।

ক) পঠিত কবিতার বিষয়বস্তু শরী'আত পরিপন্থী না হতে হবে।

গ) এর দ্বারা শুধু অন্তরে রেখাপাত করা উদ্দেশ্য হবে- এ ছাড়া আমোদ-প্রমোদ ও ক্রিড়া-কৌতুকের উদ্দেশ্যে নির্মিত সকল প্রকার বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার হারাম ও নিষিদ্ধ।

গান-বাদ্য হারাম ও নিষিদ্ধ হওয়ার দলীল ঃ

কুরআন থেকে দলীল ঃ

১. কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم-

অর্থাৎ, "আর কতক লোক এমন রয়েছে যারা অজ্ঞতাবশতঃ মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে ভ্রষ্ট বা ভ্রান্ত করার জন্য গান-বাদ্যকে ক্রয়/অবলম্বন করে।" [সূরা ৩১-লুকমান ঃ ৬]

এ আয়াতে لهو الحديث দ্বারা উদ্দেশ্য হল- 'গান-বাদ্য'। এ সম্পর্কে ইবনে আবি শাইবা, ইবনে আবিদ্দুনিয়া, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির এবং হাকিম ও বায়হাকী সহীহ সনদে আবুস সাহ্বা থেকে বর্ণনা করেন ঃ

قال سألت عبد الله بن مسعود (رض) من قوله تعالى- "ومن الناس من يشترى لهو الحيديث" قال والله الغناء- (تفسير روح المعانى چـ/١١صـ٦٧)

অর্থাৎ, আবুস সাহ্বা বলেন- আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) কে কুরআনের এ আয়াত 'ومن الناس من يشترى لهو الحيديث' সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছি। তিনি (আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) উত্তরে বলেছেন- আল্লাহর কসম! গান-বাদ্যই হল لهو الحيديث - ।

উক্ত আয়াতের অনুরূপ ব্যাখ্যা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)ও করেছেন। তিনি বলেছেনঃ 'لهو الحيديث ' হল- গান এবং গান জাতীয় ক্রিড়া-কৌতুক। (تفسير روح المعانى چـ/١١صـ٦٧) অন্যান্য মুফাস্সিরীনে কেরামও উক্ত আয়াতের এ ব্যাখ্যাই প্রদান করেছেন। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হল যে, গান বাদ্য হারাম।

২. আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের অন্য স্থানে ইরশাদ করেছেন ঃ

واستفزز من استطعت منهم بصوتك-

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, 'তুই তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস 'তোর আওয়াজ' দ্বারা সত্যচ্যুত কর। [সূরাঃ ১৭-বানী ইসরাঈলঃ ৬৪]

বিশিষ্ট তাফসীর কারক আল্লামা মুজাহিদ (রহ.) "শয়তানের আওয়াজ"-এর ব্যাখ্যা করেছেন গান-বাদ্য ও অনর্থক ক্রিড়া- কৌতুক দ্বারা (تفسير روح المعانى چـ/١١صـ٦٧) সুতরাং যে গান-বাদ্য শয়তানের আওয়াজ তা কখনো শরী'আতে বৈধ হতে পারে না।

৩. কুরআনে কারীমে অনেক জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ঃ

أمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولاتبكون سامدون-

অর্থাৎ, তোমরা কি এই বিষয়ে (কুরআনুল কারীমে) আশ্চর্যবোধ করছো? (অস্বীকার করছো?) এবং হাসছো (ঠাট্টা স্বরূপ) ক্রন্দন করছো না (নিজেদের সীমালংঘনের কারণে)? আর তোমরা ক্রীড়া-কৌতুক করছো? (তথা গান-বাদ্য বাজিয়ে মানুষকে কুরআন থেকে বিমুখ করছো? (সূরাঃ ৫৩-নাজমঃ ৫৯-৬১)

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আবূ উবায়দা বলেন ঃ

السمود الغناء بلغة حمير- (تفسير روح المعانى جـ/١٤صـ٦٧)

অর্থাৎ, হিময়ীদের পরিভাষা অনুযায়ী السمود হল গান-বাদ্য। যেমন তারা বলে থাকে- غنى لنا হে খুকি! গান শুনাওতো। يا جارية اسمدى لنا অর্থাৎ,

ইবনে আব্বাস (রা.)ও السمود এর অনুরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন-هو الغناء باليمانية অর্থাৎ ইয়ামানী ভাষায় এর অর্থ হল গান। (প্রাগুক্ত)

উপরোক্ত আয়াতে গান-বাদ্য বাজিয়ে মানুষকে কুরআন থেকে বিমূখ করার দরুন আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক কড়া ধমক প্রদত্ত হয়েছে, যা গান-বাদ্য নিষিদ্ধ হওয়াকেই বুঝায়।

সূতরাং পুর্বোল্লেখিত আয়াতত্রয় দ্বারা সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, গান-বাদ্য হারাম। সূফী সম্রাট শায়খ সোহরওয়ার্দী (রহ.)ও স্বরচিত عوارف المعارفযে উপরোক্ত আয়াতত্রয় দ্বারা গানের নিষিদ্ধতার উপর প্রমাণ পেশ করেছেন।

হাদীছ থেকে দলীল ঃ

গান-বাদ্যের নিষিদ্ধতা ও অসারতার উপর অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটি হাদীছ নিম্নে প্রদান করা হল।

১. হযরত আবূ মালিক/ আবূ আমের আশআরী (রা.)- مرفوعا বর্ণনা করেন ঃ

ليكونن من امتى اقوام سيتحلون الحر والحرير والخمر المعازف-
(صحيح بخارى جـ/٤صـ٨٣٧)

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মাঝে এমন সম্প্রদায়ের আগমন ঘটবে যারা ব্যভিচার, রেশম, মদ এবং গান-বাদ্যকে হালাল মনে করবে।

২. সুনানের মাঝে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء البقل- (تفسير روح المعانى جـ/١١صـ٦٧)

অর্থাৎ, নবী কারীম (সা.) ইরশাদ করেন- গান-বাদ্য মানুষের অন্তরে নেফাক বা কপটতা উৎপন্ন করে, যেমনিভাবে পানি যমিনে শষ্যাদি উৎপন্ন করে।

৩. হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال ما رفع احد صوته بغناء الا بعث الله تعالى اليه شيطانين يجلسان على منكبيه يضربان باعقابها على صدره حتى يمسك- (المصدر السابق)

অর্থাৎ, নবী করিম (স) ইরশাদ করেন ঃ যখনই কেউ গান শুরু করে, তখনই আল্লাহ তা'আলা তার নিকট দুই শয়তান প্রেরণ করেন। শয়তানদ্বয় তার কাঁধের উপর আরোহন করে পা দ্বারা তার বক্ষে (আনন্দচ্ছলে) আঘাত করতে থাকে- যতক্ষণ না সে গান থেকে বিরত হয়।

৪. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فى هذه الأمة خسف ومسخ وقذف- فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ! ومتى ذلك؟ قال اذا ظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور- (ترمذى جـ/٢صـ٥٤)

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেনঃ এ উম্মতের মাঝে ভূমিধস, চেহারার বিকৃতি ও প্রস্তর বর্ষণ হবে। তখন জনৈক সাহাবা প্রশ্ন করলেন হে আল্লাহর রাসূল! কখন এমনটি হবে? উত্তরে নবী (সা.) বললেন যখন তাদের মাঝে গায়িকা, বাদ্যযন্ত্র এবং মদ্যপানের প্রবর্তন ঘটবে।

৫. হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بهدم المزامنير والطبل- (الجامع لاحكام القرأن صـــ٥٣)

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) বলেছেনঃ আমি যাবতীয় বাদ্য-যন্ত্র ও ঢোল নিষিদ্ধ করার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

৬. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে ঃ

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بكسر المزامير- (المصدر السابق)

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) ঘোষণা করেছেনঃ আমি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্রকে ভেংগে ফেলার জন্য প্রেরিত হয়েছি।

৭. হযরত মুজাহিদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كنت مع ابن عمر فسمع صوت طبل فادخل اصبعيه فى اذنيه، ثم تنحى حتى فعل ذلك ثلاث مرات- ثم قال: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم- (ابن ماجه صـــ ١٣٧)

অর্থাৎ, আমি ইবনে উমরের (রা.) সাথে ছিলাম। তিনি তবলার আওয়াজ পেয়ে দু'কানে আঙ্গুল দিলেন। অতঃপর কিছুটা সরে দাঁড়ালেন। এরূপ তিনবার করার পর বললেন ঃ নবী করীম (সা.) এরূপ করেছেন।

গানবাদ্যের বৈধতার দাবিদার বিদআতীদের
কতিপয় দলীল/ প্রমাণ ও তার উত্তর

১ম দলীল ঃ

عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل على غداء بنى بى فجلس على فراشى كمجلسك منى وجويريات لنا يضربن بدفوفهن ويندين من قتل من ابائى يوم بدر الى ان قالت احداهن: وفينا نبى يعلم مافى غد- فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسكتى عن هذه وقولى التى كنت تقولين قبلها-

অর্থাৎ রুবাইয়্যি' বিনতে মুআওয়্যিজ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ স্বামীর ঘরে আমার প্রবেশের দিবসে নবী করীম (সা.) আসলেন এবং আমার বিছানার উপর এমনভাবে বসলেন যেমন তুমি আমার কাছে বসেছ। তখন আমাদের গোত্রের ছোট ছোট মেয়েরা দুফ বাজাচ্ছিল। আর বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী আমাদের পূর্ব পুরুষদের সৌয বীর্য সম্বলিত কাব্য পাঠ করেছিল। এক পর্যায়ে তাদের একজন বলে উঠল- আমাদের মাঝে এমন একজন নবী রয়েছেন যিনি ভবিষ্যতের খবর জানেন। তখন নবী করীম (সা.) তাকে বললেন, "এমন কথা বলো না বরং পূর্বে যেকথা বলছিলে তা-ই বলতে থাকো"।

খন্ডন ঃ

এ হাদীছে বিবাহের অনুষ্ঠানে- দুফা বা তাম্বুরা বাজিয়ে পূর্বসূরীদের শৌর্য বীর্যমূলক কবিতা আবৃত্তির কথা এসেছে। এটা প্রচলিত গান নয়। আর শরীয়'আতে খুশির অনুষ্ঠানে দুফ বাজানোর অনুমতি রয়েছে। তবে শর্ত হল দুফের মাঝে ঝাঁঝ- না থাকতে হবে।

দুফের ব্যাপারে মোল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন ঃ

المراد الذى كان فى زمان المتقدمين واما ما عليه الجلاجل فينبغى ان يكون مكروها بالاتفاق-

অর্থাৎ উপরোক্ত হাদীসে দুফ দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুতাকাদ্দিমীনের (পূর্ববর্তী যুগের) দুফ (যাতে ঝাঁঝ ছিল না)। আর যে দুফের মাঝে ঝাঁঝ থাকবে না।

সুতরাং কবিতা পাঠের শর্তত্রয় যথাযথ রেয়ায়েত করার পর শুধু আনন্দ খুশীর অনুষ্ঠানে ঝাঁঝ বিহীন দুফ বাজিয়ে কবিতা পাঠ করা জায়েয আছে বিধায় উপরোক্ত হাদীস দ্বারা বাদ্যযন্ত্র ও গানের বৈধতার উপর প্রমাণ পেশের কোন অবকাশ নেই।

২য় দলীল ঃ গান- বাদ্যের বৈধতার স্বপক্ষে নিম্নোক্ত হাদীসটি দ্বারাও প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা সিদ্দকিা (রা.) থেকে বর্ণিত ঃ

قالت دخل النبى صلى الله عليه وسلم وعندى جاريتان تغنيان بغناء بعاث فاضطجح على الفراش وحول وجهه ودخل ابوبكر فانتهرنى وقال مزمارالشيطان عند النبى صلى الله عليه وسلم؟ فاقبل عليه رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال : دعهما- فلما غفل غمزتهما فخرجتا وكان يوم عيد- (صحيح بخارى جـ/١صـ١٣٠ وصحيح مسلم)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) বলেনঃ নবী করীম (সা.) আমার নিকট আসলেন। তখন ছোট ছোট দুই বালিকা আমার নিকট বু'আছের যুদ্ধ সম্পর্কীয় কবিতা পাঠ করছিল। হুজুর (সা.) বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর চেহারা ফিরিয়ে নিলেন। এমন সময় আবু বকর (রা.) আসলেন এবং (মেয়েদের এ কবিতা পাঠের দরুন) আমাকে ধমক দিয়ে বললেন নবী করীম (সা.)-এর নিকট শয়তানের গান? তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকর সিদ্দিক (রা.) কে লক্ষ্য করে বললেনঃ এদেরকে ছেড়ে দিন। অতঃপর যখন তিনি অন্যমনা হলেন, তখন আমি মেয়েদেরকে বেরিয়ে যেতে ইশারা করলাম। আর সেদিনটি ছিল ঈদের দিন।

بغناء بعاث শব্দ থেকেও পরিস্কার বোঝা যায় এটা কোন প্রচলিত গান নয় বরং এটা ছিল 'বু'আছ'-যুদ্ধ সংক্রান্ত স্বপক্ষের কীর্তিগাথা ও প্রতিপক্ষের নিন্দা কাব্য।

খন্ডন ঃ

এখানে খুশির দিবসে মেয়েদুটি বাদ্য-যন্ত্র বিহীন কিংবা দুফ (ঝাঁঝ বিহীন) বাজিয়ে কবিতা পাঠ করছিল, যা শরী'আতে বৈধ। (দ্রঃ পূর্বের হাদীসের জওয়াব) এছাড়া এ হাদীসে উক্ত বালিকাদ্বয় যে প্রচলিত গান করছিল না- তার প্রমাণ হল নিম্নোক্ত হাদীস।

عن عائشة قالت: دخل على ابوبكر وعندى جاريتان من جوار الانصار تغنيان بما تقاولت الانصار يوم بعاث- قالت وليستا بمغنيتين الخ-

উপরোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এ হাদীসটিতে تغنيان শব্দদ্বয় উদ্ভূত সন্দেহটিকে দূর করে দিয়েছেন। এ হাদীসে তিনি পূর্বোল্লিখিত মেয়ে দু'টির ব্যাপারে বলেছেন- 'وليستا بمغنيتين ' অর্থাৎ, মেয়ে দু'টি গায়িকা ছিল না অর্থাৎ, তারা গান করা জানত না, তাই তারা যা পাঠ করছিল তা গান ছিল না বরং তা ছিল কবিতা পাঠ-যাকে রূপকার্থে تغنيان (গাইছিল) শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে হাদীসের যত স্থানে সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারে غنى- يغنى শব্দের ব্যবহার হয়েছে সে সকল স্থানে غناء -এর প্রথম অর্থ- 'কবিতা পাঠ করা' উদ্দেশ্য। কেননা নবী করীম (সা.) অসংখ্য হাদীসে গান নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। আর সাহাবায়ে কেরাম গান ও গান বাদ্যকে চরমভাবে ঘৃণা করতেন। তবে কখনো তাঁরা বাদ্যযন্ত্র বিহীন বৈধ কবিতা পাঠ করতেন এবং শুনতেন। আর সাহাবায়ে কেরামের এ কাজটিকেই সাহাবায়ে কেরাম গান করতেন ও শুনতেন বলে বাতিলপন্থীরা অপপ্রচার করে গান-বাদ্যের স্বপক্ষে দলীল দেয়ার হীন প্রয়াস চালিয়েছে।

৩য় দলীল ঃ

তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারাও দলীল পেশ করে থাকে ঃ

عن عائشة انها زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال النبى صلى الله عليه وسلم يا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فان الانصارى يعجبهم اللهو-(بخارى جـ/৩صـ ৭৭৫)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক দুলহানকে তার আনসারী স্বামীর ঘরে পাঠালেন। তখন নবী করীম (সা.) বললেনঃ হে আয়েশা! তোমাদের কি বিনোদনমূলক কবিতা পাঠক ছিল না? আনসাররা প্রমোদ ও বিনোদনমূলক কবিতা ভালবাসে।

বাতিলপন্থীরা দাবী করে যে, এ হাদীসে ব্যবহৃত لهو শব্দটি ব্যাপক। সব ধরণের বাদ্যযন্ত্র ও গান-এর অন্তর্ভূক্ত।

খন্ডন ঃ বাতিলপন্থীদের এ দাবীর উত্তর হল- এখানে لهو দ্বারা বাদ্যযন্ত্র বিহীন প্রমোদ ও বিনোদনমূলক কবিতা (গযল) পাঠ উদ্দেশ্য। যা বুঝা যায় 'ইবনে মাজা'-এর ১৩৭ নং পৃষ্ঠার বর্ণনা থেকে। বর্ণনাটি নিম্নরূপ ঃ

أرسلتم معها من يغني؟ قالت لا- فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الانصار قوم غزل فلو بعثتم معها من يقول:

أتيناكم أتيناكم * فحيانا وحياكم-

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) বলেছেন, "তোমরা কি কনের সাথে ছোট ছোট মেয়ে প্রেরণ করেছ? কেননা আনসাররা গযলপ্রিয়, তাই এরা গিয়ে (গযল পাঠ করত এবং) বলত ঃ

أتيناكم أتيناكم * فحيانا وحياكم-

অর্থাৎ এসেছি আমরা এসেছি; তিনি দীর্ঘজীবী করেন আমাদেরকে এবং দীর্ঘজীবী করেন তোমাদেরকে। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থ-ফতহুল বারীতে উপরোক্ত হাদীসের এরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন।

সুতরাং পুর্বোল্লিখিত হাদীস দ্বারা শুধু বৈধ কবিতা পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায়। অথবা বেশির থেকে বেশী দুফ বাজিয়ে কবিতা পাঠ করার প্রমাণ পেশ করা যায়, যা শরী'আতে অনুমোদিত। কিন্তু উক্ত হাদীস দ্বারা গান বাদ্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করার কোন অবকাশ নেই।

বস্তুত বাতিলপন্থীরা যে সকল হাদীস, আছার ও আইম্মায়ে কেরামের উক্তি দ্বারা গান-বাদ্যের স্বপক্ষে দলীল পেশ করেছেন, সেগুলোতে তারা হয়ত জলজান্ত মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছে, নয়তো অপব্যাখ্যা ও মনগড়া ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন, কিংবা তারা ভুল ব্যাখ্যার শিকার হয়েছেন।

www.waytojannah.com

সামা' (سماع) প্রসঙ্গ

সামা' (سماع)-এর আভিধানিক অর্থ শ্রবণ করা, গান, ধর্ম সঙ্গীত। পরিভাষায় সামা' বলা হয়-

كل ما لتذبه الاذن من صوت حسن- (قواعد الفقه)

ঐ শ্রুতি মধুর আওয়াজ, যদ্বারা কর্ণ পুলক অনুভব করে।

سماع - এর সংজ্ঞা এভাবেও দেয়া হয়েছে- "সামা' বলা হয় বাদ্যযন্ত্র ও বাঁশী বিহীন সূর সঙ্গীতকে।"

সামা'-র হুকুম ঃ

ইমাম গাযালী (রহ.) বর্ণনা করেন, কাজী আবুত্বায়্যিব (রহ.) সামা'র ব্যাপারে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইমাম মালিক (রহ.), ইমাম শাফিঈ (রহ.) ইমাম সুফিয়ান (রহ.) থেকে এমন শব্দ বর্ণনা করেছেন যা থেকে বোঝা যায় এসব ইমামগণের নিকট সামা' হারাম।[১৬৬]

بوادرالنوادر (বাওয়াদিরুন নাওয়াদির) নামক গ্রন্থে সামা' সম্পর্কে হাজী ইমামদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর ব্যাপক অর্থবোধক ছোট একটি উক্তি পেশ করা হয়েছে। তাহল-

অর্থাৎ, সুলূকের লাইনে প্রাথমিক পর্যায়ের যারা, সামা' তাদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর যারা এ লাইনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাদের জন্য নিষ্প্রয়োজনীয়।

হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (রহ.) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে ঃ

অর্থাৎ, সুলূকের লাইনে প্রাথমিক পর্যায়ের যারা, সামা' তাদের জন্য অত্যন্ত গোমরাহী। আর যারা এ লাইনে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে, তাদের জন্য নিষ্প্রয়োজনীয়।

ইমাম গাযালী (রহ.) احياء علوم الدين গ্রন্থে পাঁচটি শর্ত পূরণ করা এবং পাঁচটি অন্তরায় থেকে বেঁচে থাকার শর্তে সামা' কে মুবাহ বলেছেন।[১৬৭] যে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হবে তা হল ঃ

---

[১৬৬] حق السماء صـ/৩.

[১৬৭] ভন্ড পীর ফকীরগণ ইমাম গাযালী (রহ.) সামাকে জায়েয বলেছেন- এ কথাটি অত্যন্ত ফলাও করে প্রচার করে থাকেন, কিন্তু তিনি যেসব শর্ত বলেছেন, সেগুলোর উল্লেখ তারা করেন না। বস্তুতঃ তিনি যে সব শর্তারোপ করেছেন, তার আলোকে ঐ সব ভন্ড পীর-ফকিরদের আচরিত সামা'কে কোনক্রমেই বৈধ বলা যাবে ন।

www.waytojannah.com

১. সঙ্গী, স্থান ও কাল- এই তিনটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। স্থানের প্রতি লক্ষ্য রাখার অর্থ হল সামা' এমন স্থানে হতে হবে যাতে লোক চলাচল বিঘ্ন না ঘটে এবং হট্টগোল না হয়। আর কাল বা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রাখার অর্থ হল এমন সময়ে সামা' না করা যাতে শরঈ বা তবয়ী কোন কাজের ব্যাঘাত ঘটে।
২. এমন মুরীদের সম্মুখে সামা' শুনা যাবে না, যাদের জন্য সামা' ক্ষতিকর। এমন মুরীদ তিন প্রকার। (বিস্তারিত জানার জন্য দ্রঃ حق السماع)
৩. অত্যন্ত মনোযোগিতার সাথে কান লাগিয়ে শুনতে হবে। এদিক সেদিক দৃষ্টি দোয়া যাবে না। এমনকি সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের দিকেও দৃষ্টি দেয়া যাবে না।
৪. দাঁড়িয়ে জোরে আওয়াজ করতে পারবে না।
৫. যদি কোন সাদিকুলহাল ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সকলে তার অনুসরণ করবে।
আর যে পাঁচটি অন্তরায় থেকে বেঁচে থাকতে হবে তা হল ঃ
১. যে শোনাবে সে গায়রে মাহ্‌রাম মহিলা হতে না পারবেনা এবং দাড়িবিহীন বালক হতে পারবে না।[১৬৮]
২. যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র এবং মদ ইত্যাদি থাকলে হবে না।
৩. সামা'র বিষয়বস্তু অশালীন, কামোদ্দীপক ও শিরক মিশ্রিত হতে পারবে না।
৪. যৌবনের প্রাবল্য না থাকা। সূতরাং মাঝে যৌবনের তেজ এবং যৌন উত্তেজনার প্রাবল্য বিদ্যমান, তার জন্য সর্বাবস্থায় সামা' হারাম।
৫. সামা' শ্রবণকারী ব্যক্তি দ্বীনি জ্ঞান সম্পর্কে অজ্ঞ সাধারণ মানুষ হলে হবে না।
শায়খ আবূ আব্দির রহমান সুলামী বলেন ঃ আমি আমার দাদাকে বলতে শুনেছি- সামা' শ্রবণকারী কলব বা অন্তরকে জিন্দা আর নফ্‌স তথা প্রবৃত্তিকে মৃত করে নিবে। এর বিপরীত ঘটলে সামা' শ্রবণ করা হারাম। আর কলব জিন্দা হয় কলবের গুণাবলী উজ্জীবিত করা দ্বারা এবং নফসের মৃত্যু হয় নফসের স্বভাবজাত চাহিদাগুলি দমন করা দ্বারা। কলবের গুণাবলী হল ঃ ইলম, ইয়াকীন, শোকর, যিক্‌র, খাশিয়্যাত বা খোদাভীতি, খোদাপ্রেম প্রভৃতি। আর নফসের স্বভাবজাত চাহিদা হল কাম, ক্রোধ, অহংকার, হিংসা, পরশ্রী কাতরতা, সম্মানপ্রীতি প্রভৃতি।
বলা বাহুল্য- বর্তমান যামানার বে-শরা ফকীরদের মাঝে পূর্বোল্লেখিত ৫টি শর্তের একটিও পাওয়া যায় না। আবার সামা'র অন্তরায় ৫টি বিষয়ের সবগুলোই তাদের মাঝে পাওয়া যায়। তাই রদ্দুল মুহ্‌তারে (শামীতে) বলা হয়েছে ঃ

---

[১৬৮] আল্লামা তাহের পাটনীও অনুরূপ বলেছেন ঃ
وما احدثه المتصوفة من السماع بالات فلا خلاف فى تحرمية- (مجمع بحار الانوار جـ/٤، صـ/٧١)
অর্থাৎ সূফীগণ বাদ্যযন্ত্র সহকারে যে সামা'র উদ্ভব ঘটিয়েছেন, তা হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মতবিরোধ নেই ॥

www.waytojannah.com

وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس اليه ومن قبلهم لم يفعل كذالك-

অর্থাৎ, আমাদের যামানার বে-শরা ফকীররা যা করে থাকে তা সম্পূর্ণ হারাম। তাদের অনুষ্ঠানে যাওয়ার ইচ্ছা করা এবং সেখানে বসা জায়েয নেই। আর (তারা পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন গান- বাদ্য করেছেন বলে যে বরাত দিয়ে থাকেন তা সঠিক নয়।) পূর্ববর্তী বুযুর্গানে দ্বীন কখনও তাদের মত গান-বাদ্য করেননি।

ফাতাওয়ারে আলমগিরীতে উল্লেখ করা হয়েছে। ইমাম হুলওয়ানী (রহ.) কে স্বঘোষিত মা'রেফতী ফকীরদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি এই উত্তরই প্রদান করেছেন।[১৬৯]

আল্লামা ইবনুস সালাহ তার ফতওয়ায় দীর্ঘ আলোচনার পর বলেন ঃ

فاذن هذا السماع حرام باجماع اهل الحل والعقد من المسلمين- (تفسير روح المعانى جـ/١١ صـ/٢٩)

অর্থাৎ, মুসলমানদের সকল ইমামে সর্বসম্মত মতে এই সামা' হারাম।

"ফতওয়ায়ে শামীতে 'সামা'র শর্ত সমূহ বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে-

والحاصل انه لارخصة فى السماع فى زماننا لان الجنيد تاب عن السماع فى زمانه- (رد المختار جـ/٥ صـ٢٣٠)

অর্থা, মোটকথা, আমাদের যামানায় সামা'র কোন অনুমতি নেই। যেহেতু হযরত জুনাঈদ (রহ.) তার যুগে সামা' থেকে তওবা করেছেন।

সারকথা ঃ সামা' মুবাহ হওয়ার ক্ষেত্রেই মতানৈক্য রয়েছে। বহু মনীষী স্বমূলেই সামা'কে নাজায়েয বলেছেন। যারা সামা'কে কতিপয় শর্ত সাপেক্ষে মুবাহ বলেছেন, তারা এমন সব শর্তারোপ করেছেন যা এ যামানায় পালিত হচ্ছে না। সাম্প্রতিক কালের বাস্তব অবস্থা হল বে-শরা ফকীররা গান-বাদ্য ও নারী সমন্বিত নাচ-গানের আসরকে বুযুর্গানে দ্বীন কর্তৃক চর্চিত সামা' বলে চালিয়ে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে এবং এই সামা'কে তারা ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় বলে মনে করছে। এভাবে তারা একদিকে বুযুর্গদের প্রতি মিথ্যা নেছবত প্রদান করে চলেছে, অপরদিকে তারা দ্বিগুণ পাপে জর্জরিত হচ্ছে। প্রথমতঃ হারাম করার কাজ করার পাপ, দ্বিতীয়তঃ সেই হারাম কাজকে ইবাদত মনে করার পাপ। সুতরাং বর্তমান যুগের প্রচলিত সামা' সর্বশ্রেণীর উলামায়ে কেরামের মতে সন্দেহাতীত ভাবেই হারাম এবং কবীরা গুনাহ্।

---

[১৬৯] عالمكيرى جـ/٤ صـ/١١٠ .

www.waytojannah.com

ওরশ প্রসঙ্গ

ওরশ- এর অর্থ ঃ

ওরশ (عرس) -এর আভিধানিক অর্থ বিবাহ, বাসর। পরিভাষায় ওরশ বলতে বোঝায় বৎসরান্তে কোন ওলী ও বুযুর্গের মাযারে সমবেত হয়ে ধুমধাম সহকারে ফাতেহাখানী, ঈসালে ছওয়াব, ভোজ ইত্যাদির আয়োজন করা।

ওরশ-এর হুকুম ঃ

ওরশ-এর ক্ষেত্রে দুটো বিষয় পালিত হয়ে থাকে।

(এক) ঃ বৎসরান্তে নির্দিষ্ট দিনে কোন ওলী ও বুযুর্গের কবর যিয়ারতে সমবেত হওয়া এবং ঈসালে ছওয়াব করা অর্থাৎ, মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা।

(দুই) ঃ সংশ্লিষ্ট ওলী ও বুযুর্গের কবর দূরে হলে প্রয়োজনে সেই উদ্দেশ্যে সফর করা।

একন ওরশের হুকুম বুঝতে হলে এই দুটো বিষয়ের হুকুম পৃথক পৃথক ভাবে বোঝা আবশ্যক।

১ম বিষয়ের হুকুম ঃ

বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি সুধারণা রাখা এবং মহব্বত পোষণ করা, যথাযথভাবে তাঁদের পদাংক অনুসরণ অনুকরণ করে চলা এবং তাঁদের মৃত্যুর পর নিয়মানুসারে ইছালে সাওয়াব করা, তাঁদের মর্যাদা বুলন্দির জন্য দু'আ করা- এসবই প্রশংসনীয় কাজ এবং উত্তম আমল সমূহের অন্তর্ভূক্ত। তবে কবর যিয়ারাতের জন্য কোন দিনকে নির্দিষ্ট করে সকলেই সেদিনে সমবেত হওয়াকে শরী'আত আদৌ সমর্থন করে না। বিশেষ করে বৎসরান্তে এক দিনকে নির্দিষ্ট করা যাকে পরিভাষায় ওরশ বলা হয়- শরী'আতে এর কোনই ভিত্তি নেই। নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেন ঃ

لاتجعلوا قبرى عيدا- (نسائى- مشكوة جـ/١٨٢)

অর্থাৎ, তোমরা আমার কবরকে ঈদ বানিও না।

মুহাদ্দিসীনে কেরাম এর বিভিন্ন অর্থ ও ব্যাখ্যা দিয়েছেন-

এক ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে- "لاتجعلوا للزيارة اجتماعكم للعيد " অর্থাৎ, তোমরা ঈদে সমবেত হওয়ার মত যিয়ারতের জন্য সমবেত হয়ো না। আর ওরশের মাঝে এমন সমাবেশই ঘটানো হয়ে থাকে- যা থেকে নবী করীম (সা.) নিষেধ করেছেন।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে ঃ

المراد الحث على كثرة الزيارة اى لاتجعلوا كالعيد الذى لايأتى فيس اسنة الامرة- (ذكره فى المرقات- هامش مشكوة- جـ/١صـ ٨٦

অর্থাৎ, এর দ্বারা মানুষকে বেশী বেশী যিয়ারাতের উপর উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে যে, তোমরা আমার কবরকে ঈদের মত বানিও না, যা বৎসরে একবার পালন করা হয়। বরং বেশী বেশী আমার কবর যিয়ারাত কর। আর ওরশও বৎসরে একবার উদযাপিত হয়। সুতরাং ওরশ করা হাদীস পরিপন্থী। আর নবী করীম (সা.) এর কবরেই যখন ওরশ করা জায়েয নেই, তখন অন্য কারও কবরে তো এমনটি জায়েয হওয়ার প্রশ্নই আসে না।

উপরোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) লিখেছেন ঃ

لاتجعلوا زيارة قبرى عيدا- اقول هذا اشارة الى سدمدخل التحريف كما فعل اليهود والنصرى بقبور انبيائهم وجعلوها عيدا وموسما بمنزلة الحج- (حجة الله البالغة جـ/٢)

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) যে বলেছেনঃ তোমরা আমার কবর যিয়ারাতকে ঈদ বানিও না। আমি বলব- এর দ্বারা ইশারা করা হয়েছে যেন তাহ্‌রীফের পথ বন্ধ হয়ে যায়। কেননা ইয়াহুদ নাসারারা তাদের আম্বিয়া (আ.)-এর কবরকে হজ্জের মতো ঈদ এবং মওসূমী বানিয়ে নিয়েছে।

যেমনিভাবে হজ্জের জন্য বিশেষ সময়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে তা আঞ্জাম দেয়া হয়, ঠিক তেমনিভাবে ইয়াহুদী নাসারারা তদের নবীদের কবরের সাথেও এমন করে থাকে। আর নামকা ওয়াস্তে মুসলমানরা আম্বিয়ায়ে কেরামের পরিবর্তে

আউলিয়া কেরামের কবরের সাথে বরং বানাওয়াটি কবরের সাথে এমনটি করে থাকে। যা দেখে ইয়াহুদী নাসারাগণও লজ্জিত হয়।

হযরত শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) আরও লিখেছেন ঃ

ومن اعظم البدع ما اخترعوا فى امور القبور واتخذوها عيدا تفهيمات اليه جـ/٢صـ٦٤)

অর্থাৎ, ঐ সকল বিষয়ও বড় বিদ'আত সমূহের অন্তর্ভূক্ত, কবরের ব্যাপারে মানুষ যা উদ্বোধন করেছে এবং কবরকে তারা ঈদের মত মেলায় পরিণত করেছে।

হযরত শাহ আব্দুল আযীয (রহ.) বলেন ঃ কবর যিয়ারাতের জন্য দিন নির্দিষ্ট করা বিদ'আত। মূলতঃ যিয়ারত করা জায়েয কিন্তু তার জন্য সময় নির্দিষ্ট করা (যা উলামায়ে সালাফের মাঝে ছিল না) বিদ'আত।[১৭০]

হযরত কাজী ছানাউল্লাহ হানাফী বলেন ঃ

لايجوز ما يفعله الجهال بقبور الاولياء والشهداء من السجود والطواف حولها واتخاذ السرج والمساجد عليها ومن الاجتماء بعد الحول كا لاعياد ويسمونه عرسا (تفسير مظهرى جـ/٢صـ ٢٥)

অর্থাৎ, অজ্ঞ, মুর্খরা আউলিয়া ও শুহাদাদের কবরের সাথে যা করে থাকে, এসব নাজায়েয। তথা কবরকে সাজদা করা, কবরের চর্তুর পাশে তাওয়াফ করা, বাতি জ্বালানো, তাদের দিকে ফিরে সাজদা করা এবং বৎসরান্তে ঈদের মত সেখানে সমবেত হওয়া যাকে তারা ওরশ বলে।

আর ارشاد الطالين এবং পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে-

"আউলিয়ায়ে কেরামের কবরকে উঁচু করা, কবরের উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, ওরশ করা, বাতিজ্বালানো- এ ধরনের আরও যা আছে সব বিদ'আত। কতকতো

---

[১৭০] . فتاوى عزيزى صـ/١٧٢

হারাম আর কতক মাকরূহ" । নবী করীম (সা.) কবরের পাশে বাতি প্রজ্বলনকারী এবং সাজদাকারীদের উপর লা'নত করেছেন ।

হযরত শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক (রহ.) লিখেন ঃ

مقر رسا ختن روز عرس جائز نيست- (مسائل اربعين صـــ ٣٨)

অর্থাৎ. ওরশের দিন ধার্য করা জায়েয নেই ।

২য় বিষয়ের হুকুম ঃ

পূর্বে বলা হয়েছে বুযুর্গানে দ্বীনের কবর যিয়ারাত করা, মৃত্যুর পর নিয়মানুসারে তাঁদের উদ্দেশ্যে ঈছালে ছওয়াব করা, তাঁদের মর্যাদা বুলন্দির জন্য দু'আ করা এসবই প্রশংসনীয় এবং উত্তম কাজ । সেমতে যদি কোন বুযুর্গের কবর ধারে কাছে হয়, তাহলে সেখানে উপস্থিত হয়ে দু'আ করা ও শরয়ী তরীকায় সালাম পৌঁছানো এসব জায়েয । তবে যদি কোন বুযুর্গের কবর অনেক দূরে হয়- তাহলে যিয়ারতের জন্য সেখানে সফর করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের নিকট বিতর্কিত বিষয় । যারা নিষেধের পক্ষে তারা নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন ।[১৭১]

لاتشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. الحديث-

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন ঃ আমার কাছে কবর, কোন আল্লাহর ওলীর এবাদতখানা এবং তুর পর্বত এ সবগুলোই উপরোক্ত হাদীসের নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভূক্ত ।[১৭২]

তিনি আরো বলেন ঃ কেউ যদি আজমীর শরীফে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশতি (রহঃ)-এর কবরে কিংবা হযরত সালার মাসউদ গাজীর কবরে অথবা এ ধরনের অন্য কোন কবরে গিয়ে কোন প্রয়োজন পূরণের তলব করে, তাহলে সে হত্যা এবং যিনার চেয়ে মারাত্মক গুনাহ করল ।[১৭৩]

---

[১৭১] এ হাদীছ সম্পর্কে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । দেখুন পৃষ্ঠা নং ৪৪৮॥

[১৭২] হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯২ ॥

[১৭৩] تفهيمات الهيه جـ/٢ صـ/٤٥ .

হযরত মাওলানা ইউসুফ বিন্নৌরী (রহ.) হযরত আনওয়ার শাহ কাশমীরী-র বরাত দিয়ে বলেছেন আওলিয়ায়ে কেরামের কবর যিয়ারতের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সফরের পক্ষে স্বতন্ত্র দলীল চাই। উপরোক্ত হাদীস যথেষ্ট নয়। যদিও ইমাম গাযালী (রহ.) বলেছেন, উপরোক্ত হাদীসে তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মসজিদের অতিরিক্ত কোন ফযীলত না থাকায় তার উদ্দেশ্যে সফর করতে নিষেধ করেছেন তবে বিভিন্ন ওলীর সাথে বিভিন্ন জনের মুনাসাবাত থাকার কারণে তাদের কবর যিয়ারাতের দ্বারা ফায়দা হতে পারে এ হিসেবে তার জন্য সফর করাতে কোন ক্ষতি না থাকা চাই।

আল্লামা শামী নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা কোন ওলীর কবর দুরে হলে তার জন্য সফর করা যেতে পারে বলে মত দিয়েছেন।

ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يأتى قبور الشهداء بأحد رأس كل سنة– (مصنف ابن ابى شيبة)

অর্থাৎ, নবী করীম (সা.) প্রত্যেক বৎসরের মাথায় ওহুদ প্রান্তরে শহীদগণের কবরের কাছে আসতেন।

তবে এই ইস্তিদলাল পূর্ণাঙ্গ নয়। কেননা, রাসূল (সা.) শুহাদায়ে ওহুদের কবর যিয়ারতের জন্য মদীনা থেকে ওহুদের পাদদেশে গিয়েছিলেন। এটাকে কোন সফর বলা যায় না। মদীনা থেকে ওহুদ মাত্র তিন মাইলের পথ।

ওরশ-এর পক্ষে দলীল ও তার খন্ডন ঃ

মৌলভী আব্দুস সামী' সাহেব, মুফতী আহ্মদ ইয়ার খান সাহেব ও সুরেশ্বরীর পীর সাহেব প্রমুখ ওরশপন্থী অনেকেই উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা ওরশ পালন তথা নির্দিষ্ট দিনে কবরের কাছে গমন ও ঈছালে ছওয়াব করার পক্ষে দলীল দেয়ার চেষ্টা করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে, নবী করীম (সা.) বৎসরান্তে শুহাদায়ে ওহুদের কবরের পাশে যেতেন। অর্থাৎ, সেখানে যেয়ে সালাম বলতেন ও দু'আ করতেন। তাদের এ দলীল ঠিক নয়। কেননা এ রেওয়ায়েতে বৎসরান্তে নবী (সা.) গমনের কতা উল্লেখ আছে তবে সেটি নির্দিষ্ট তারিখেই হত এমনটি

হাদীস দ্বারা স্পষ্ট নয়। তদুপরি সেখানে ওরশের মত সমবেত হওয়া এবং কুরআন তেলাওয়াত ও ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদির কথা প্রচলিত ওরশ বলতে যা বোঝায় তার উল্লেখ নেই। উপরোক্ত রেওয়ায়েত দ্বারা শুধু এতটুকু বলা যেতে পারে যে, কবর যিয়ারাতের উদ্দেশ্যে সফর হতে পারে। যদিও এই ইস্তিদলাল পূর্ণাঙ্গ নয় কেননা, পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল (সা.) শুহাদায়ে ওহুদের কবর যিয়ারতের জন্য মদীনা থেকে ওহুদের পাদদেশে গিয়েছিলেন। এটাকে কোন সফর বলা যায় না। মদীনা থেকে ওহুদ মাত্র তিন মাইলের পথ।

মোট কথা- এমন কোন সহীহ্ আকলী (যুক্তিগ্রাহ্য) ও নকলী (কুরআন হাদীছে বর্ণিত) দলীল নেই যা ওরশের বৈধতার পক্ষে দলীল হতে পারে।

ওরশ-এর কথিত ফায়দা ও তার খন্ডন ঃ

মুফতী আহমদ ইয়ার খান সাহেব ওরশ পালন তথা নির্দিষ্ট দিনে সমবেত হওয়ার উপকারিতা সম্বন্ধে লিখেছেন ঃ ওরশের সময় নির্দিষ্ট করা হলে মানুষের জমায়েত হওয়া সহজ হয়। তারা সমবেত হয়ে, কুরআন তেলাওয়াত, কালিমায়ে তাইয়্যিবা এবং দুরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে থাকে। এতে অনেক বরকত ও ছওয়াব অর্জিত হয়।[১৭৪]

মুফতী সাহেবের একথা গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা শায়খ আলী মুত্তাকী হানাফী লিখেছেন ঃ

الاجتماع لقراءة القرأن على الميت با لتخصيص فى المقبرة او المسجد او ابيت بدعة مذمومة-(رسالة رد بدعت)

অর্থাৎ, বিশেষ করে কবরস্থানে, মসজিদে এবং বাড়ীতে মৃত ব্যক্তির উপর কুরআন তেলাওয়াতের জন্য সমবেত হওয়া বিদ'আত।

সুতরাং সমবেত হওয়াটাই যখন বিদ'আত তখন কুরআন তেলাওয়াতের জন্য জমায়েত হওয়ার কোন অর্থই হতে পারে না।

---

[১৭৪] جاء الحق صـ/٣٠٩ .

www.waytojannah.com

রাজতন্ত্র

(রাজনৈতিক মতবাদ বিষয়ক)

(Monarchy[মনার্কি])

"রাজতন্ত্র" বলতে সাধারণত: অবাধ ক্ষমতার অধিকারী বংশানুক্রিম রাষ্ট্রপ্রধান শাসিত রাষ্ট্র বা উক্ত পন্থায় রাজ্য শাসন পদ্ধতিকে বুঝায়। নির্বাচিত বা বলপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী কোন একমাত্র লোক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও তার শাসনকে রাজতন্ত্র বলা হয়।

আইনানুগ নিয়ম দ্বারা রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হলে তাকে 'সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র' বলে। গণপ্রতিনিধিদের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা চলে যাওয়ার রাজা কেবল নামমাত্র রাষ্ট্রপ্রধানে পরিণত হলে তাকে "নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র" বলে। গণপ্রতিনিধিদের নিকট বা অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা চলে গেলে প্রকৃতপক্ষে তা রাজতন্ত্র নয় বরং গণতন্ত্র বা 'অভিজাততন্ত্র'। ইংল্যান্ডে রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হতে হতে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। রাজা (বা রাজপদে আসীনা রাণী) সেকারনে জাতীয় একতার প্রতীক মাত্র; নিজের ব্যক্তিগত প্রভাব ছাড়া রাজা (বা রাণী) হিসেবে তার কোনই বাস্তব শাসন ক্ষমতা নেই। সম্ভবতঃ রাজতন্ত্রই পৃথিবীর প্রাচীনতম সরকার বা রাজ্যশাসন পদ্ধতি। কোন না কোন কালে প্রায় সব দেশেই কমবেশ এটা ছিল। রাজা বিধিদত্ত ক্ষমতায় শাসন করেন- এই বিশ্বাসও প্রচলিত ছিল। জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রথম শক্তিশালী রাজতন্ত্ররূপে গড়ে ওঠে। রোম সাম্রাজ্যে, মধ্যযুগে সর্বত্র, বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্স, এবং ১৯শ শতক পর্যন্ত রাশিয়া, তুরস্ক, প্রূশিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন রাজতন্ত্র ছিল। এখনও এশিয়া এবং আফ্রিকার কয়েকটি দেশে এরূপ পদ্ধতি টিকে আছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে রাজতন্ত্র সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ

ইসলামে রাজ্যশাসন কি হবে তা নির্দিষ্ট। তা হল কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে রাজ্য পরিচালনা পদ্ধতি তথা ইসলামী খেলাফত পদ্ধতি। তবে সরকার প্রধান নির্বাচনের পদ্ধতির ক্ষেত্রে বাহ্যতঃ ইসলামে কয়েকটা পদ্ধতি প রিদৃষ্ট হয়। যথাঃ

১. পর্ববর্তী খলীফা কর্তৃক পরবর্তী খলীফার মনোয়ন। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) তাঁর পরবর্তী খলীফা হিসেবে হযরত ওমর (রা.) কে মনোনীত করে যান। উম্মতের সর্বসম্মত মতে এটা জায়েয। তাবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে পরামর্শক্রমে এটা করেছিলেন।

এ ক্ষেত্রে মনোনয়নকৃত পরবর্তী খলীফা যদি মনোনয়ন দানকারী খলীফার পুত্র হন, তাহলে প্রচলিত রাজতন্ত্রের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটা রাজতন্ত্র আখ্যায়িত হবে, কেননা সেটা বংশানুক্রমিক রাষ্ট্রপ্রদান শাসিত রাষ্ট্র হয়ে যায়। তবে অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে ইসলামে তা অবকাশ রয়েছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেছেন এটা যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে পরামর্শক্রমে হতে হবে। যেমন হযরত মু'আবিয়া (রা.) তাঁর পুত্র ইয়াযীদকে পরামর্শক্রমে মনোনয়ন দিয়ে যান এবং সাহাবায়ে কেরামের মৌন ইজমা (ঐক্যমত্য) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের ও হযরত হুসাইন (রা.) ইয়াযীদের বিরোধিতা এ কারণে করেননি যে, ইয়াযীদ রাজতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁরা কখনও এ কথা বলেননি যে, ইয়াযীদের মনোয়ন শুদ্ধ নয়। বরং তারা বিরোধীতা করেছেন অন্য কারণে। হযরত হুসাইন (রা.) কে কূফার লোকেরা খলীফা বানাতে চেয়েছিলেন এবং তিনি মনে করেছিলেন ইয়াযীদের তুলনায় তিনি খলীফা হওয়ার অধিক যোগ্য। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে তিনি কূফায় রওয়ানা দিয়েছিলেন। তারপর পথিমধ্যে তিনি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। জিহাদের নিয়তও তাঁর ছিল না, নতুবা নারী ও শিশুদেরকে তিনি সঙ্গে নিতেন না। তদুপরি জিহাদের নিয়ত থাকলে মক্কা থেকে রওয়ানা হওয়ার সময় যেসব সাহাবী তাকে বাঁধা দিয়েছিলেন, তিনি তাঁদেরকে বলতে পারতেন যে, জিহাদে বাঁধা দেয়া অন্যায়; তোমরা কেন সে অন্যায় করছ? হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রা.) ও ইয়াযীদের তুলনায় নিজেকে খেলাফতের অধিক যোগ্য বিবেচনায় ইয়াযীদের বিরোধিতা করেন। এই বিরোধিতার ক্ষেত্রে তিনিও এ কথা কখনও বলেননি যে, ইয়াযীদের মনোনয়ন অবৈধ, তাই তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে।

২. খলীফা তার পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য বিশেষ জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি বোর্ড গঠন করে দিয়ে যেতে পারেন। যেমন হযরত ওমর (রা.) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য ছয় সদস্য বিশিষ্ট একটি বোর্ড গঠন করে দিয়ে যান।

Contents

৩. খলীফা তাঁর পরবর্তী খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের বিষয়টি জনগণের উপর ছেড়ে দিয়ে যাবেন। তারপর জনগণই তাদের খলীফা মনোনীত করবে। যেমন হযরত উছমান (রা.) তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের বিষয়টি পরবর্তীদের উপর ছেড়ে দিয়ে যান।

উপরোক্ত তিনিটি পদ্ধতির সরকথা হল খলীফা মনোনয়ন করবে সাধারণ জনগণ অথবা জনপ্রতিনিধিগণ তথা যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষের (اهل حل و عقد)। যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষ (اهل حل و عقد) বলতে বোঝায় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা, নো কর্মকর্তা ও জাতীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন নেতৃবৃন্দ। যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন কর্তৃপক্ষে সাথে পরামর্শক্রমে কাউকে মনোনয়ন দেয়া হলে সেটা প্রচলিত গণতন্ত্র বিরোধী এবং রাজতন্ত্র বলে মনে হলেও ইসলামে সেটার অবকাশ রয়েছে। যেমন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) হযরত ওমর (রা.)- এর বেলায় করেছিলেন।

এখানে উল্লেখ্য যে, কেউ বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করেক্ষমতা সুসংহত করে নিতে পারলে এবং কিছু লোক তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করে নিলে অর্থাৎ তাকে খলীফা হিসেবে স্বীকার করে নিলে অন্যরা তাকে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দিবেন। ইসলামের ইতিহাসে এরূপ দেখা যায় বলপূর্বক ক্ষমতা দখল করার পর কিছু লোক তার হাতে বাই'আত গ্রহণ করলে অর্থাৎ তাকে খলীফা হিসেবে স্বীকার করে নিলে অন্যরা তাকে খলীফা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তখনকার উলামা, ফুকাহা ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন তার খেলাফতকে অবৈধ ঘোষণা দেননি। প্রচলিত গণতন্ত্রবাদীদের কাছে এটা রাজতন্ত্রের বা সৈরতন্ত্রের কাছাকাছি বলে মনে হলেও এটা খলীফা মনোনয়নের কোন বিধিবদ্ধ পদ্ধতি নয়। এটা শুধু ফিতনা থেকে রক্ষার একটা সামরিক পদ্ধতি।[১৭৫]

*****

[১৭৫] তথ্যসূত্র ঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ৪র্থ খণ্ড, الاحكام السلطانية للماوردة (خلافت راشده) ও تاريخ ملت ও অন্যান্য ॥

www.waytojannah.com

নাৎসীবাদ

(Nazism/জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদ)

'নাৎসীবাদ' বা Nazism বলতে বোঝানো হয় জার্মানির "ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি" (জাতীয় সমাজতন্ত্র শ্রমিক দল)- এর আদর্শকে। একে জাতীয় সমাজতন্ত্র" (National Socialism/ন্যাশন্যাল সোশ্যালিজম) ও বলা হয়। নাৎসী (Nazi) কথাটি এই দলের নামের সংক্ষিপ্ত আকার (NSDAP) থেকে উৎপন্ন। জার্মান-একনায়ক নেতা এ্যাডলফ হিটলার (১৮৮৯-১৯৪৫?) এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৩৩-৪৫ খৃষ্টাব্দে এই মতবা হিটলারের একদলীয় একনায়কত্বাধীন শাসনের কর্মসূচী হয়। তার ক্ষমতা দখর করার পর একমাত্র নাৎসী দলই আইন সঙ্গত দল বলে স্বীকৃত হয়।

এ্যাডলফ হিটলারের জন্ম উত্তর অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউ-য়ে। তিনি ছিলেন জনৈক অস্ট্রীয় শুল্ক বিভাগীয় কর্মচারীর পুত্র। লেখাপড়া শিখেন মিউনিকে। ১৯০৭ এবং তৎপর কয়েক বৎসর চরম দারিদ্র্যের মধ্যে কাটান। তার ইয়াহুদী বিরোধী মনোভাব তখন বেড়ে উঠে। ১ম বিশ্বযুদ্ধে বাভেরীয় সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি হন; করপোরাল পদে উন্নীত হন, সাহসিকতার জন্য আয়রন কূস লাভ করেন। যুদ্ধের পর তিনি এবং কতিপয় অসন্তুষ্ট ব্যক্তি মিউনিকে ন্যাশন্যাল সোশ্যালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি (NSDAP) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৮-৯ই নভেম্বর তথাকথিত "বিয়ারহল পুচ্" নামে পরিচিত বিদ্রোহের মাধ্যমে জোরপূর্বক বার্ভোয়ার উপর আধিপত্য লাভের প্রয়াস পান। পাঁচ বৎসরের জন্য লানৎসবেক দুর্গে কারাবাসের দণ্ডপ্রাপ্ত হন, সেখানেই তিনি নাৎসীবাদের বাইবেল "মাইন কামপফ" (আমার সংগ্রাম) বইখানি লিখেন। ১৩ মাস পর তিনি মুক্তি পান। ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী মন্দা হিটলারের পার্টির (NSDAP) বিস্ময়কর বিকাশে সাহায্য করে।

জাতীয়তাবাদ, ইয়াহুদী বিরোধী আন্দোলন এবং আরও কয়েকটি পুঁজিবাদ-বিরোধী মতের সমাহার থাকার ফলে নাৎসিবাদ জনমনকে আকর্ষণ করে।

জার্মাণ সমাজিক গণতন্ত্রবাদ ও কমিউনিজমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য ধনিক শ্রেণীর লোকেরাও নাৎসীবাদের সমর্থন করে। হিটলারের গ্রন্থ "মাইন কাম্‌ফপ" ও অংশতঃ আলফ্রেট রোযেন বের্ক- এর ভূয়া দর্শনের উপর ভিত্তি করে এবং গোবিনো ও চেমবারলিনের জাতিভেদ মতবাদের সূত্রের উপর এই নাৎসীবাদ-মতবাদ গড়ে ওঠে। ইতালীয় ফ্যাসিবাদ ও নীচা (Nietzsche)-এর অতি মানব সম্পর্কিত মতবাও এতে ইন্ধন যোগায়।

*** নাৎসীবাদের প্রধান নীতিগুলি ছিল নিম্নরূপ ঃ**

১. একজন অভ্রান্ত নেতার পরিচালনায় নর্ডিক বা আর্য 'প্রভূ' জাতির শ্রেষ্ঠত্ব;

২. তৃতীয় রাইশ (Third Reich) নামে প্যান জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপন এবং ইয়াহুদী ও কমিউনিষ্টদের মত জার্মানির 'পরম শত্রুদিগকে' বিলোপ সাধন।

৩. জনগণের ইচ্ছা "শক্তিই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে" এবং "জার্মানির নিয়তি" প্রভৃতি কথাগুলো সর্বদা আওড়ানো হত।

৪. অভ্যন্তরীণ দমননীতি ও পরদেশ আক্রমণ নাৎসীদের দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত বলে গণ্য হত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর নাৎসীবাদের দ্বারা লক্ষ লক্ষ নর নারীর হত্যার অভূতপূর্ব নৃশংসতা প্রকাশ পায়।[১৭৬]

*** ইসলামের দৃষ্টিতে নাৎসীবাদ সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ**

ইসলামের দৃষ্টিতে কোন জাতির পার্থিব শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য অপর কোন জাতির উপর চড়াও হওয়া এবং যুদ্ধের ন্যায়সংগত কারণ ছাড়া নিছক জাতিগত বিদ্বেষ নিয়ে অপর কোন জাতিকে নিধনে অবতীর্ণ হওয়ার কোন বৈধতা নেই। কোন দলীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য দমননীতি চালানোরও কোন অবকাশ নেই। 'জনগণের ইচ্ছা'-র নামে স্বেচ্ছারিতা চালানো কোন অবস্থাতেই স্বীকৃত পেতে পারে না। আর "শক্তিই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে" ন্যায়নীতির কোন বালাই থাকবে না- এমন নীতি গোয়ার্তুমী বলে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। আর কোন জাতির নিয়তি তার নিজের হাতে, যেমন- "জার্মানির নিয়তি" কথাটা দ্বারা বোঝানো হয়েছে- এ কথাটি সন্দেহাতীত ভাবেই কুফরী কথা।

---

[১৭৬] তথ্যসূত্র ঃ মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড।

সাম্রাজ্যবাদ

(imperialism)

"সাম্রাজ্যবাদ" (imperialism) বলতে সাধারণভাবে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর শাসন ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করাকে বুঝায়।

ইতিহাসের সূচনা হতে মিসর, মেসোপটেমিয়া, আসিরীয়া, এবং পারসিক সাম্রাজ্য বিদ্যমান ছিল। প্রাচীন রোমক এবং বাইযেন্টাইন সাম্রাজ্যে এবং পরে উসমানীয়া তুর্কী সাম্রাজ্যের আমলে সাম্রাজ্যবাদ চরম আকার ধারণ করে। পাশ্চাত্যে আধুনিক জাতীয় ভাব ধারা দ্বারা প্রণোদিত রাষ্ট্রসমূহ গড়ে উঠার ও নব নব দেশ আস্কিারের যুগ হতে সাম্রাজ্যবাদের অভ্যুদয় ঘটে। উপনিবেশ কায়েম করে বলপূর্বক ইউরোপীয় নেতৃত্ব কায়েম করা হয় এবং স্থানীয় অধিবাসীদের উপর কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। হিটলারের নাৎসীবাদে এরূপ কল্পিত জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার চিন্তা পরিলক্ষিত হয়। জার্মান জাতির কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠাই ছিল তাদের লক্ষ্য। স্পেন ও পর্তুগাল 'বাণিজ্যিক' সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ ও ফরাসীরা "ঔপনিবেশিক" সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির মূল কারণ ছিল বাণিজ্যবাদ। যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম দিকে বিস্তৃত হয়, এটা ছিল "সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত লক্ষ্য বিশিষ্ট" (manifestdesiny) রাজ্যবিস্তার। পরে স্পেন-মার্কিন যুদ্ধের ফলে মার্কিন সাম্রাজ্য গড়ে উঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চিন্তাধারা প্রবল হয়; কিন্তু ফ্যাসিবাদী জার্মানী ও জাপান চরম সাম্রাজ্যবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকে। অপর পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিফাইনকে স্বাধীনতা দিতে থাকে, ল্যাটিন আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কর্মসূচী অবলম্বন করে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ শিথিল হয়ে কমনওয়েলথ অব নেশনস গঠিত হতে থাকে। এশিয়া ও আফ্রিকার অনেকাংশে স্বাধীনতার দাবিসূচক আন্দোলনসমূহ তীব্র হতে দেখা যায়।

www.waytojannah.com

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যবাদও অবমানের পর্যায়ে উপনিত হয়। ফরাসী অধিকৃত দেশসমূহের পূর্ণগঠন, ভারতীয় উপমহাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন (বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত), বার্মা, মালয়েশিয়া এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য বহু প্রাক্তন উপনিবেশ ও পরাধীন দেশের স্বাধীনতা অর্জন ২য় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সাম্রাজ্যবাদ অবসানের ইতিহাসকে স্মরণীয় করে রেখেছে। কমিউনিষ্টদের অভিমত পাশ্চাত্য জাতিগুলি এখনও সাম্রাজ্যবাদী, কারণ তারা এখন রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা লাভবান হয়।

* ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্রজ্যবাদ সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ

ইসলাম বৈষয়িক স্বার্থে এক জাতি কর্তৃক অপর জাতির উপর শাসনক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তারকে অনুমোদন দেয়া না। ইসলাম মানবজাতির ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ সাধণের লক্ষ্যে ইসলাম গ্রহণের দাওয়াত প্রদান করে। এই দাওয়াতে সাড়া দিলে ইসলাম করও দেশ দখল, কারও উপর প্রভৃত্ব কায়েমকরণ ও কারও উপর কোনরূপ বৈষয়িক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে যায় না। তবে ইসলামের আহ্বানে সাড়া না দিলে ইসলাম জিহাদের বিধান প্রদান করেছে এবং বিজিত অমুসলিম জনপদের লোকগণ ইসলাম গ্রহণ না করলে তাদের উপর জিযিয়া ধার্য করার বিধান রেখেছে। এর উদ্দেশ্য হল যেন সত্য ও সঠিক ধর্ম ইসলামের ঝান্ডার মাথা উঁচু হয়ে থাকে এবং সঠিক ধর্ম ইসলাম প্রচারিত ও পালিত হওয়ার পথে কোনরূপ বাঁধা অবশিষ্ট না থাকে।

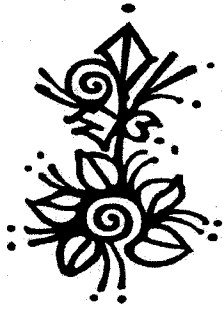

গণতন্ত্র

(Democracy)

"গণতন্ত্র" শব্দটি গ্রীক শব্দ (Democracy) (ডিমক্র্যাসি)- এর অনুবাদ। পরিভাষায় গণতন্ত্র/ Democracy বলা হয় জনসাধারণের প্রতিনিধি দ্বারা সাম্যের নীতি অনুসারে রাষ্ট্রশাসন করা। গণতান্ত্রিক সরকার বলা হয় কোন শ্রেণী, গোষ্ঠি বা ব্যক্তিবিশেষ কর্তৃক শাসনের পরিবর্তে রাষ্ট্রের সকল নাগরিকের নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত সরকারকে।

খৃষ্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতকে গ্রীক নগর রাষ্ট্রগুলিতে সর্বপ্রথম গণতন্ত্রের উন্মেষ ঘটে। রোমান প্রজাতন্ত্রে জন-প্রতিনিধিত্ব নীতির উদ্ভব হয়। শাসিত ও শাসকের মধ্যে চুক্তি বিদ্যমান থাকার নীতি মধ্যযুগে উদ্ভূত। পিউরিট্যান বিপ্লব, মার্কিন স্বাধীনতা বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লবের প্রভাবে আধুনিক গণতন্ত্রের প্রসার ঘটে। জন লক, জে.জে রূশো, ও টমাস জেফারসন গণতন্ত্রবাদের প্রভাবশালী তাত্ত্বিক ছিলেন। প্রথমে রাজনৈতিক ও পরে আইন সম্পর্কীয় সমান অধিকারের দাবী উত্থাপনের ফলে গণতন্ত্র বর্ধিত হয়। পরবর্তীকালে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের দাবিও গণতন্ত্র সম্প্রসারণের সহায়ক হয়। প্রতিযোগিতাশীল রাজনৈতিক দলসমূহের অস্তিত্বের উপর আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কারণ প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণ কর্তৃক প্রতিনিধি নির্ধারণের জন্য নির্বাচন আবশ্যক। গণতান্ত্রিকগণ মনে করেন একমাত্র রাজনৈতিক গণতন্ত্রের মাধ্যমেই জনগণের সুযোগ সবিধার সাম্য রক্ষা সম্ভব। পক্ষান্তরে সমাজতান্ত্রিকদের অভিমত হল অর্থনৈতিক গণতন্ত্রই একমাত্র ভিত্তি, যার উপর সত্যিকার রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সৌধ নির্মাণ করা যেতে পারে।

ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র সম্বন্ধে পর্যালোচনা ঃ

* প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি মাত্র একটাই। আর তাহল সাধারণ নির্বাচন। পক্ষান্তরে ইসলামী খেলাফত পদ্ধতিতে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচনের পদ্ধতি বহুবিধ, যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

* প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের ছোট-বড়, যোগ্য-অযোগ্য, বুদ্ধিমান-নির্বোধ নির্বিশেষে সকলের রায় বা মতামত (ভোট সমানবাবে মূল্যায়িত হয়ে থাকে। কিন্তু রাসূল (সাঃ) খোলাফায়ে রাশেদা ও আদর্শ যুগের কর্মপন্থা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ইসলাম মতামত গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথ

www.waytojannah.com

কর্তৃত্ব সম্পন্ন যোগ্য কর্তৃপক্ষ (*ارباب حل وعقد*) -এর মতামতের মূল্যায়ন করে থাকে। ঢালাওভাবে সকলের মত গ্রহণ ও সকলের মতামতের সমান মূল্যায়ন দ্বারা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছার বিষয়টি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। কুরআনের একটি আয়াতে এদিকে ইংগিত পাওয়া যায়। আয়াতটি এই ঃ

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ-

অর্থাৎ, যদি তুমি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দিবে। [সূরা আনআম ঃ ১১৬]

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা হয়। জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থি। কেননা ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহকেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ-

অর্থাৎ, তুমি বল সমস্ত কিছুর কর্তৃত্ব (সর্বময় ক্ষমতা) কার হাতে ? [সূরা মু'মিনুন ঃ ৮৮]

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء-

অর্থাৎ, তুমি বল হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান কর এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নাও। [সূরা আল ইমরান ঃ ২৬]

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়। অথচ বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র- এর ধারণা ঈমান-আকীদার পরিপন্থি। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ- অর্থাৎ, কর্তৃত্বতো আল্লাহ্‌রই। [সূরা আনআম ঃ ৫৭]

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ যা অবতীর্ণ করেছেন, তদানুসারে যারা বিধান দেয় না তারা কাফের। [সূরা মায়িদা ঃ ৪৪]

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ-

অর্থাৎ তুমি তাদেরকে দেখনি যারা দাবী করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে তারা ঈমান এনেছে, অথচ তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়, যদিও তাদেরকে তা প্রত্যাখান করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [সূরা নিসা ঃ ৬০]

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়- এটা কুফরী।[১৭৭]

*** ইসলামী গণতন্ত্র ঃ**

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। একমাত্র জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবধকতা নেই। বরং যথাযথ কর্তৃত্ব সম্পন্ন জনপ্রতিনিধি দ্বারাও সরকার প্রধান নির্বাচিত হতে পারে। এর বিপরীত প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি হল জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হওয়া। অতএব প্রচলিত গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে এই একটি বিরাট মৌলিক ব্যবধান রয়েছে। তদুপরি প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা হয় এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইনের অথরিটি মনে করা হয়। আর পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থি। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহকেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয়। আর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা ঈমান-আকীদা বিরোধী। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা কোনভাবেই ইসলামে স্বীকৃত নয়। অতএব 'ইসলামী গণতন্ত্র' বলে কোন কথা ইসলামে নেই। 'গণতন্ত্র' একটি ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ পরিভাষা। এ পরিভাষার সাথে ইসলাম শব্দটি যোগ করলেই তা ইসলামে স্বীকৃত বলে গণ্য হতে পারে না। আর ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এটিকে কিছু ব্যাখ্যা সাপেক্ষেও ইসলামী পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়।

---

[১৭৭] মুক্তধারা কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা বিশ্বকোষ, ২য় খন্ড, কিতাবুল ঈমান, আহকামে যিন্দেগী ও الحكام السلطانية للماوردى প্রভৃতি থেকে গৃহীত।

www.waytojannah.com

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ

(Secularism)

আভিধানিক অর্থ ঃ

Secularism'সেকিউলারিজম' একটি ল্যাটিন শব্দ। Secularism থেকে উদ্ভূত। তার অর্থ বৈষয়িক, অস্থায়ী এবং প্রাচীন। গীর্জার কোন পাদ্রী যদি বৈরাগ্যবাদী জীবন পরিহার করে বৈষয়িক জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করে, তাহলে তাকে 'সেকিউলার' বলা হয়। বাংলায় এর অনুবাদ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অথবা বৈষয়িকতাবাদ কিংবা ধর্মহীনতাবাদ।

আভিধানিক অর্থে ধর্মনিরক্ষতা (ধর্ম+নিরপেক্ষতা=ধর্মনিরপেক্ষতা)- এর অর্থ দাঁড়ায় 'নিরপেক্ষতা' অর্থ-স্বতন্ত্র, স্বাধীন, পক্ষপাতশূণ্য ইত্যাদি, সুতরাং ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ধর্মের পক্ষপাতশূন্যতা।

এখানে উল্লেখিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র বা ধর্মের ব্যাপারে ব্যক্তি স্বাধীনতা-র অর্থ যদি কাউকে কোন ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বাধ্য না করা, তাহলে ইসলামের সাথে এ অর্থের কোন সংঘাত নেই। কারণ ইসলাম জোরপূর্বক কাউকে ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করে না। এ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেরই স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্রকে সে অক্ষুণ্ন রেখেছে এবং ইসলামে কোন পক্ষপাতিত্বও নেই। ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার প্রত্যেকের সমান। এ অর্থে ইসলামে ধর্মীয় পক্ষপাতশূন্যতা বিদ্যমান।

পারিভাষিক অর্থ ঃ

পরিভাষায় ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism অর্থ ধর্মের প্রভাব থেকে রাজ্য, নীতি, শিক্ষা ইত্যাদিকে মুক্ত রাখা।[১৭৮] যারা এই ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা, ব্যক্তিগত জীবনে ধর্ম-কর্ম করার বিরুদ্ধে তাদের কোন আপত্তি নেই। তারা সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার পরিপন্থি।

---

[১৭৮] ইংরেজীতে বলা হয় ঃ The doctrine that state, morality, education, etc. should be sepatated from religion.

ধর্মকে তারা নিতান্ত ব্যক্তিগত ও ঘরোয়া ব্যাপার স্যাপরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চান। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক অঙ্গন থেকে ধর্মকে নির্বাসিত করাই তাদের লক্ষ্য। এক শ্রেণীর প্রগতিশীলরা এটাকে আধুনিক মতাদর্শের মর্যাদা দিয়ে থাকেন।

"সেকিউলারিজম"- এর উৎপত্তি ইউরোপে। উনবিংশ শতকে একজন ইংরেজ চিন্তাবিদ 'সেকিউলারিজম'- কে একটা বিশ্বজনীন আন্দোলনে রূপ দেয়ার চেষ্টা চালান। এরা নিজেদেরকে সেকিউলারিষ্ট, বৈষয়িকতাবাদী-ধর্মবিমুক্ত চিন্তাবিদ পরিচয় নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেন। এদের মধ্যে বিশিষ্ট স্থান দখল করেছিলেন জি. জে. হলিউক (১৮৫৪ খ্রী.)। সেকিউলারিজমকে প্রতিষ্ঠিতকরণ প্রচেষ্টায় হলিউকের সহকর্মীদের মধ্যে চার্লস সাউথ ওয়েস, থমাস কুপার, থমাস পিটার্সন ও উইলিয়াম বিল্টন প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। হলিউক ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'সেকিউলারিজম' পরিভাষাটি রচনা করেন।

ইউরোপে পাদ্রীদের মনগড়া মতামতের সাথে যখন গবেষক ও বৈজ্ঞানিকদের গবেষণালব্ধ মতামতের দ্বন্দ্ব দেখা দিল এবং তারই ভিত্তিতে পাদ্রীদের উৎখাত করার জন্য 'গীর্জা বনাম রাষ্ট্রের লড়াই' নামক দু'বৎসর ব্যাপী ঐতিহাসিক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম পরিচালিত হল, তখন সংস্কারবাদীরা একটা আপোষ রক্ষার জন্য মার্টিন লুথারের নেতৃত্বে প্রস্তাব দিল যে, ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে সীমাবদ্ধ থাকুক আর সমাজের ও পার্থিব জীবনের সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্ব রাষ্ট্রের উপর ন্যাস্ত থাকুক। এখান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মতবাদের যাত্রা শুরু হয়। এরপর থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে খৃষ্টান ধর্মযাজক ও পাদ্রীদের প্রভাব নিঃশেষ হয়ে যায়। ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন ধর্মীয় প্রবনতা থেকে মুক্ত হয়ে পড়ে।

ঐতিহাসিকভাবে সেকিউলারিজম সব সময় নাস্তিকতাবাদের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী নেতা ব্রেডলেফ-এর মত ছিল ধর্মীয় আকীদা-বিশ্বাস প্রতিহত করাই সেকিউলারিজম এর কর্তব্য তিনি মনে করতেন ধর্মের এই সব কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাস যতদিন পর্যন্ত পূর্ণ শক্তিতে প্রকাশিত হতে থাকবে, ততদিন পর্যন্ত বস্তুগত উন্নতি লাভ করা সম্ভব হবে না।

www.waytojannah.com

ধর্মনিরপেক্ষতা-র পারিভাষিক অর্থ ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের **আচরিত অর্থে ধর্ম** নিরপেক্ষতা একটি কুফরী মতবাদ। কারণ ধর্মের ব্যাপকতায় রাজ্যনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সবকিছু আওতাভুক্ত। ইসলাম জীবনের সব ক্ষেত্র এবং সব কিছুর জন্য আদর্শ। এমন কিছু নেই, যার আদর্শ ইসলামে অনুপস্থিত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ-

অর্থাৎ আমি তোমার প্রতি নাযিল করেছি এই কিতাব যা সবকিছুর সুস্পষ্ট বর্ণনা ও হেদায়েত। [সূরা নাহ্‌ল ঃ ৬৯]

مَّا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ-

অর্থাৎ, আমি এই কিতাবে কোন কিছু বর্ণনা করতে ছেড়ে দেইনি। [সূরা আনআম ঃ]

কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতা মতবাদে ইসলামের এই ব্যাপকতাকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা হয়। আর ইসলামের কোন অংশকে অস্বীকার বা অপছন্দ করা কুফরী। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসকে কেউ যদি কুসংস্কারমূলক ধারণা বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করে, তাহলে তার ঈমান থাকে না।

খৃষ্টান ধর্মযাজকদের মতবাদে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক কর্মকান্ড পরিচালনার মত কোন সুষ্ঠু আদর্শ বর্তমান ছিল না। ফলে তাদের সমাজে ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন হয়তোবা যুক্তিযুক্ত ছিল। কিন্তু ইসলাম মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের জন্য শাশ্বত আদর্শ রেখেছে এবং তা স্বয়ং সর্বজান্তা সর্বজ্ঞ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আদর্শ। তাই ইসলামে ধর্মনিরপেক্ষতার কোন যৌক্তিকতা বা কোন অবকাশ নেই।

জাতীয়তাবাদ
(Nationalism)

জাতীয়তাবাদ কথাটি ইংরেজি Nationalism (ন্যাশনালিয্‌ম)- এর অনুবাদ। Nationalism অর্থ জাতি। আরবীতে 'কওম' (قوم) অর্থ জাতি। আর "কওমিয়্যাত" (قوميت) অর্থ জাতীয়তা। এই কওম ও কওমিয়্যাত তথা জাতি ও জাতীয়তা-এর কোন একক ও দ্ব্যর্থহীন বা সর্বজনগ্রাহ্য অর্থ আজ পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। অভিধানে তা 'জাতি' অর্থ লেখা হয় ধর্ম, জন্মভূমি, রাষ্ট্র, আদিমবংশ ব্যবসা প্রভৃতির ভিত্তিতে বিভক্ত শ্রেণী বিশেষ। কোন কোন অভিধানে 'জাতীয়তা' বা Nationalism এর অর্থ করা হয়েছে স্বদেশানুরাগ বা দেশাত্মবোধ। এটা একটা মোটামুটি অর্থ নতুবা আমাদের দেশেও জাতীয়তা নির্ধারিত হয় কি ভৌগলিক সীমারেখার ভিত্তিতে না ভাষার ভিত্তিতে অর্থাৎ, বাংলাদেশী জাতীয়তা না বাঙালী জাতীয়তা তা নিয়ে এখনও মতবিরোধ বিরাজমান। অথচ উভয় মতাবলম্বীই স্বদেশানুরাগ বা দেশাত্মবোধ-এর প্রবক্তা, এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই।

কেউ কেউ 'জাতীয়তা'-এর সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে- জাতীয় মঙ্গলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতবাদ। কিন্তু এ সংজ্ঞায় উল্লেখিত 'জাতীয় মঙ্গল' কথাটার মধ্যে 'জাতীয়' কথাটার কি অর্থ তাইতো অস্পষ্ট রয়ে গেল। সংজ্ঞার মধ্যেই এটা স্পষ্ট করাইতো মুল প্রতিপাদ্য ছিল। তদুপরি এতে জাতীয়তার ভিত্তি কি (ধর্ম, না ভাষা, না ভৌগলিক সীমারেখা, না সাংস্কৃতিক ঐক্য, না অন্য কিছু) তারও কোন দ্ব্যর্থহীন সমাধান বের হয়ে আসেনি।

প্রাচীন আরবদের নিকট কওমিয়্যাত বা জাতীয়তার ভিত্তি ছিল রক্ত সম্পর্ক ও বংশীয় পরিচয়ের ঐক্য। যাদের রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয় এক, তারা এক কওম বা জাতি হল একই পূর্বপুরুষ হতে উদ্ভূত জনগোষ্ঠি বা গোত্র। কুরআনে কারীমে 'কওম' শব্দটি এ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। হযরত নূহ, হুদ, সালেহ প্রমুখ নবীদের দাওয়াত প্রসঙ্গে তাঁরা তাদের আদর্শ অমান্যকারীদেরকে يَاقَوْمِ অর্থাৎ, হে আমার জাতি! বলে আহ্বান করতেন বলে উল্লেখিত হয়েছে। তারা

নবীদের আদর্শিক ঐক্যে একিভূত জাতি ছিল না বরং তরা ছিল রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয়গত ঐক্যে একিভূত জাতি ।

নিম্নোক্ত আয়াতেও উপরোক্ত অর্থেই 'কওম' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে ঃ

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ-

অর্থাৎ (রাসূল [সা.]-এর নিকট ইসলাম গ্রহণকারী জ্বিনগণ তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গিয়ে তাদেরকে সম্বোধন করে বলেছিল) হে আমাদের সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে আহ্বানকারীর আহ্বানে সাড়া দাও এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন কর। তাহলে তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। [সূরা আহ্কাফ ঃ ৩১]

আবার আদর্শিক ঐক্যে একিভূত জাতি অর্থেও কুরআন-হাদীছে 'কওম' বা জাতি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন হাদীছে এসেছে ঃ

اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم فى الحيوة الدنيا-

অর্থাৎ, তারা (কাফেরগণ) এমন সম্প্রদায় যাদের ভাল কাজের বদলা তাদেরকে পার্থিব জীবনেই দিয়ে দেয়া হয়েছে। [বুখারী]

من تشبه بقوم فهو منهم- (احمد وابو داؤد)

অর্থাৎ, যে অন্য জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে সেই জাতির অন্তর্ভূক্ত বলে গণ্য হবে।

কুরআনে কারীমে জাতি কথাটার আরও এক রকম প্রয়োগ দেখা যায়। হযরত লূত (আ.) মুলতঃ ছিলেন ইরাকের অধিবাসী। তাঁর জ্ঞাতি-গোষ্ঠি ছিল ইরাকে। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সাদূম এলাকার অধিবাসীদের নিকট। সেখানে তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠির কেউ ছিল না। তার নিকট বালকের আকৃতিতে ফেরেশতারা আগমন করলে সে এলাকার লোকেরা অসদুদ্দেশ্যে তাদের নিকট আসে। তখন হযরত লূত (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন ঃ হে আমার জাতি! তোমরা প্রয়োজনে আমার কন্যাদেরকে বিবাহ কর, তবুও আমার মেহমানদেরকে তোমরা অপমানিত করনা। আয়াতটি এই ঃ

قَالَ يَا قَوْمِ هَـــؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي-

অর্থাৎ, হে আমার জাতি, এই আমার কণ্যাগণ রয়েছে, তারা তোমাদের জন্য (নিয়মানুসারে) অধিক পবিত্র (হতে পারে)। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে তোমরা আমার মেহমানদের বিষয়ে অপমানিত কর না। [সূরা হুদ ঃ ৭৮]

স্পষ্টতইঃ তিনি তাদেরকে আদর্শিক ঐক্য বা রক্ত সম্পর্ক ও বংশ পরিচয়গত ঐক্যের ভিত্তিতে নিজের জাতি বলে আখ্যায়িত করেন নি। বরং বলা যায় আঞ্চলিক বা ভৌগলিক সীমারেখা ভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতেই তিনি তাদেরকে নিজের জাতি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন।

কুরআন-হাদীছে জাতি ও জাতীয়তার এবং বিধ বহুরূপী প্রয়োগ থাকার কারণে দ্ব্যর্থহীনভাবে এটা বলা যায় না যে, জাতীয়তার ভিত্তি হল ধর্ম। আবার এটাও বলা যায় না যে, জাতীয়তার ভিত্তি বংশ, বর্ণ বা ভৌগলিক সীমারেখা বা অন্য কিছু। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্‌মীরী (রহ.) ও হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) বলতেন- জাতীয়তার ভিত্তি ধর্ম নয়, অবস্থার প্রেক্ষিতে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীকেও মুসলমান তার জাতি বলে আখ্যায়িত করতে পারে।

মুলতঃ ইসলাম 'জাতি' বা 'জাতীয়তা'-কে কোন দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধক পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করেনি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন বিভিন্ন সময়ে অবস্থার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি বিভিন্ন এ্যাঙ্গেলে এ দুটোকে পরিভাষায় রূপ দিয়েছে এবং জাতীয়তার ভিত্তি কি সে বিষয়ে নিজ নিজ স্বার্থ বা অবস্থা ভিত্তিক মতামত প্রদান করেছে। বিংশ শতাব্দির প্রথম কয়েক দশক উছমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে আরব দেশসমূহের জাগরণ ও আরব জাতিসমূহের মুক্তি আন্দোলনের অর্থ আরব জাতীয়তাবাদ কথাটার ব্যবহার শুরু হয়। তারপর আরবদের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের উপায় হিসেবে তারা আরব জাতীয়তাবাদ (القومية العربية) শব্দের ব্যাপক ব্যবহার শুরু করে। তখন থেকে আরব জাহানের চিন্তাবিদগণ আরব জাতীয়তাবাদকে একটি দৃঢ় মতবাদের রূপ দিতে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। ১৯৩৬ সালে ফিলিস্তীনে আরব মুসলিম ও ইয়াহুদীদের মধ্যে সংঘটিত সংঘর্ষে মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদ নব শক্তিতে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বর্তমানকালে আরব জাতীয়তাবাদের প্রধান উদগাতা হল বাথ

(Bath) পার্টি। ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে এ পার্টি গঠিত হয়। কিন্তু আরব জাতীয়তাবাদের তাৎপর্য, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য কি তা আজও অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন রয়ে গেছে। এভাবে বিভিন্ন সময় উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে, উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকায়, তুরস্কে, ইরান ইত্যাদি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন অর্থে জাতীয়তাবাদ কথাটার ব্যবহার করা হয়। ভারত বর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের প্রশ্নকে মুখ্য বিবেচনায় সব ধর্মের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বহু উলামায়ে কেরাম মুসলিম হিন্দু ধর্ম নির্বিশেষে সকল ধর্মালম্বী এক জাতি-এরূপ এক জাতিতত্ত্বের ধারণা পেশ করেন। আবার মুসলিম স্বাতন্ত্র ও মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা বোধকে উদ্বুদ্ধ করার চেতনায় অনেকে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার দর্শন পেশ করেন। তারা হিন্দু মুসলিম দুই জাতি-এরূপ দ্বিজাতিতত্ত্ব-এর ধারণা পেশ করেন। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য বরাবরই রাজনৈতিক ও কৃষ্টি-কালচার ভিত্তিক এক জাতীয়তার দর্শন পেশ করে আসছে।

কেউ কেউ ন্যাশনালিয্ম বা জাতীয়তাবাদ কথাটিকে জাতীয় মঙ্গল ও উন্নতির জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বিবেচনা করে এর পক্ষ নিয়ে থাকেন। তাদের ধারণায় এর বৈশিষ্ট্য এবং উপকারিতার মধ্যে রয়েছে স্বদেশ প্রেম, রাজনৈতিক এবং কৃষ্টিগত মূল্যবোধ ও জাতীয় লক্ষ্যের উপর বিশ্বাস। তারা বলেন- জনগণকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার জন্য জাতীয়তাবাদ কথাটার দ্বারা সুফল পাওয়া যায়। তারা মনে করেন এটা জাতিতে শক্তিশালী করে তোলে। আবার কেউ কেউ জাতীয়তাবাদ কথাটাকে অপছন্দ করেন এ কারণে যে, এর দ্বারা এক ধরণের উগ্রতাবোধ জাগ্রত হয়, যা অবাঞ্ছিত পরিণতি ডেকে আনে। ১৯শ শতকে বিভিন্ন দেশে উদ্ভব হওয়া উগ্র জাতীয়তাবোধের ফলে বহু দেশের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন দেশের সঙ্গে অনেক সংঘর্ষ সৃষ্টি হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার করা যায় না। হিটলার মুসোলিনী যে উগ্র জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করেছিল, তার ক্ষতি জগতবাসী স্পষ্টতঃই প্রত্যক্ষ করেছে। এ কারণে তারা জাতীয়তাবাদকে পৃথিবীতে বিভেদ সৃষ্টিকারী শক্তি বলে মনে করেন।

সারকথা জাতি বা জাতীয়তা কোন ইসলামী পরিভাষা নয়। এ পরিভাষা কোন দ্ব্যর্থহীন অর্থবোধকও নয়। এটা অস্পষ্টতার ধুম্রজালে আচ্ছন্ন। তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি করা বা এটাকে ভিত্তি করে কোন দর্শন ও আন্দোলন দাঁড় না করানোই শ্রেয়।

বহুল প্রচলিত ও প্রচারিত জাল ও দুর্বল হাদীসসমূহ ঃ

পরিশেষে সর্ব সাধারণের জ্ঞাতার্থে আমরা এখানে সমাজে বহুল প্রচারিত জাল ও দুর্বল হাদীসের কতিপয় উদাহরণ পেশ করছি, যেন প্রিয় পাঠকগণ সে সকল কথা বার্তা শুনলেই বুঝতে পারেন যে, এগুলো হাদীস নয়। যদিও তা 'হাদীস' নামে সমাজে প্রচলিত হয়ে গেছে।

১. "হে মুহাম্মদ! আপনি না হলে আসমান যমীন সৃষ্টি করতাম না।"- এটি জাল হাদীস। [আল ফাওয়ায়িদ, হাদীস- ১০১৩, সিলসিলা যয়ীফাহ, হাদীস ঃ ২৮৩]

২. "আমি আল্লাহর নূর থেকে সৃষ্ট আর মুমিনগণ আমার নূর থেকে সৃষ্ট"- এটিও একটি জাল হাদীস, বস্তুতঃ রাসূল্লাহ (সা.) এর নূর দ্বারা সৃষ্টি হওয়ার ব্যাপারে একটি হাদীসও সহীহ নেই। [ফাতাওয়া ইমাম ইবনু তায়মিয়া ঃ ১৮/৩৩৬। তানযীহুশ শরীয়াহ ঃ ২/৪০২]

৩. "আহারের পূর্বেও পরে লবন খাওয়া সুন্নাত এবং এতে সত্তরটি উপকার রয়েছে।"- এ হাদীসটি জাল ও ভিত্তিহীন। [আল মাছনু- মুল্লা আলী ক্বারী, তাহক্বীক আবুগুদ্দা, টীকা নং ৭৬]

৪. "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্রের সমতুল্য। এদের যে কোন এক ব্যক্তিকে অনুসরণ করলে হিদায়েতের উপর থাকবে।"- হাদীসটি জাল। সিলসিলা যয়ীফা- আলবানী ঃ ১/১৪৪/৫৮, ইকামাতুল হুজ্জাহ- তাহকীক, শায়খ আবুগুদ্দাহ, টীকা পৃ ঃ ৫১]

৫. "আমার উম্মতের ইখতেলাফ [মতানৈক্য] রহমত বয়ে আনবে।"- আল্লামা ইবনে হাযম বলেন- হাদীসটি মিথ্যা ও বাতিল। শায়খ আলবানী বলেন- হাদীসটি জাল। আল্লামা সুবকী বলেন- উক্ত কথাটির সহীহ, দুর্বল বা কোন মনগড়া সনদও পাইনি। [যয়ীফাঃ ১/১৪]

৬. "আমার উম্মতের আলেমগণ বনী ইসরাঈলের নবীদের সমতুল্য।"- হাদীসটি ভিত্তিহীন এবং জাল [মাকাচেদঃ ৭০২, ফাওয়ায়েদ ঃ ২/৩৬৮, যয়ীফ ঃ ১/৬৭৯/৪৬৬]

৭. "আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হল তার প্রবেশ দ্বার।"- হাদীসটি জাল ও বাতিল। আল লাআলীঃ ১/১৭০, ফাওয়ায়েদঃ ৩৪৭, ইবনে আরাকঃ ১/৩৭৭]

৮. "জ্ঞান অর্জন কর যদিও চীন দেশে গিয়ে হোক।"- হাদীসটি বাতিল ভিত্তিহীন। [সিলসিলা যয়ীফাঃ ১/৬০০/৪১৬]

৯. "যে ব্যক্তি আমার উম্মতের জন্য ধর্ম সংক্রান্ত ৪০টি হাদীস আয়ত্ব করে, আল্লাহ তাআ'লাতাকে ফকীহ করে কবর থেকে তুলবেন এবং আমি তার সাফায়াতকারী ও সাক্ষী হব।"- মুহাদ্দিসগণের ঐক্যমতে হাদীসটি দুর্বল। [ফাওয়ায়েদ ঃ ২/৩৭৩/৯২০, যয়ীফা ঃ ১/৬০২]

১০. "একজন আলেম শয়তানের মোকাবেলায় এক হাজার (জাহিল) ইবাদতকারী (দরবেশের) চেয়েও অধিকভারী।"- হাদীসটি নিতান্তই দুর্বল বা জাল। [আল কাশ্‌ফঃ ২/৫১৪/৫৯৯, কাশফুল খাফাঃ ২/১৩২, ফয়জুল কাদীরঃ ৪/৪৪২, মাকাছেদঃ ৮৬৪]

১১. "বাতেনী ইলম হল আল্লাহর একটি গুপ্তভেদ। বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার অন্তরে তা দান করেন।" হাদীসটি জাল [তানযীহুশ শরীয়াঃ ১/২৮০/১০৫]

১২. "আসমান এবং জমীনে আমার স্থান হয়না অথচ মুমিন বান্দার অন্তরে আমার স্থান নয়।"- হাদীসটি জাল। [ইবনে আরাক্কঃ ১/১৪৮, আলমুগনিঃ ৩/১৪, ফাতওয়াঃ ১৮/১২২]

১৩. "মুমিনের অন্তর হল আল্লাহর ঘর বা আল্লাহর আরশ।"- হাদীসটি জাল ও ভিত্তিহীন। ইবনে আররাক্কুঃ ১/৪৮, ফাতওয়াঃ ১৮/১২২, কাশফঃ ২/৯৯]

১৪. "যে ব্যক্তি নিজকে চিনেছে, সে আল্লহর পরিচয় লাভে ধন্য হয়েছে।"- হাদীসটি জাল ও ভিত্তিহীন। [মাকাছেদঃ ২৮, যয়ীফাঃ ৩৮৬, মাছনূঃ ১০৬, আসরারঃ ৪১৩, যয়ীফাঃ ৭৮।]

১৫. "দেশ প্রেম ঈমানের অন্তর্ভূক্ত।"- হাদীসটি জাল [মাকাছেদঃ ৩৮৬, যয়ীফাঃ ৩৬, মাছনূঃ ১০৬, আসরারঃ ৪১৩, যয়ীফাঃ ৭৮।]

১৬. "মুমিনের উচ্ছিষ্টে রয়েছে শেফা (রোগমুক্তি), মুমিনের লালায়ও আছে শেফা।"- হাদীসটি ভিত্তিহীন ও জাল [কাশফঃ ১/৫৫৫, মাছনূঃ ১৫৯, আসরারঃ ৪৯০, যয়ীফাঃ ৭৮]

১৭. "যে ব্যক্তি দুই ঈদের রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে, কেয়ামতের দিন তার অন্তর মরবে না।" অন্য বর্ণনায় আছে- 'যে ব্যক্তি চারটি রাত্রি জাগ্রত হয়ে ইবাদত করবে তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যাবে। 'তারবিয়া' তথা জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখের রাত্রি, আরাফার রাত্রি, কোরবানীর রাত্রি এবং ঈদুল ফিতরের রাত্রি।" এ হাদীসদ্বয় জাল। [যয়ীফা ২/১১, ১২/৫২০, ৫২২।]

১৮. "সর্বোত্তম দিন হল আরাফার দিন যদি তা জুমার দিনে হয়। আর জুমার দিনে হজ্জ অন্য দিনের হজ্জের চেয়ে সত্তর গুণ ভাল।" হাদীসটি বাতিল। [যয়ীফাঃ ১/৩৭৩/২০৭।]

১৯. "যে ব্যক্তি হজ্জ করে আমার যিয়ারতে আসল না সে আমার সাথে অন্যায় করল।" হাদীসটি জাল [যয়ীফাঃ ১/১১৯/৪৫]।

২০. "প্রত্যেক বস্তুর অন্তর রয়েছে, কুরআনের অন্তর হল সূরা ইয়াসীন। যে ব্যক্তি সূরা ইয়াসীন পড়বে সে যেন দশ বার কুরআন খতম করল।" হাদীসটি জাল। [ইলালঃ ২/৫৫, যয়ীফাঃ ১৬৯]।

২১. "যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমাবারে মাতা পিতার কবর যিয়ারত করবে এবং সুরা ইয়াসিন পাঠ করবে তার গুণাহসমূহ আয়াত এবং অক্ষরের হিসাব মতে ক্ষমা করে দেয়া হবে।" হাদীসটি জাল। [ইবনে আদীঃ ১/২৬৮, মওযুআতঃ ৩/২৩৯, লাআলীঃ ২/৪৪০]।

২২. "আমি এক গুপ্ত ভাণ্ডার ছিলাম। অতঃপর আমি পরিচিত হওয়ার মানসে বিশ্বচরাচর সৃষ্টি করলাম।"- এটি জাল ও ভিত্তিহীন কথা। [আলমাকাছিদ (৮৩৮) দুরার (৩৩০) 'আল্ মাছনূ' (২৩২) তময়ীযঃ (১২২) তানযীহুশ শরীয়াহঃ ১/১৪৮।]

২৩. "মুর্খ ব্যক্তির ইবাদত করা থেকে আলেমের নিদ্রা উত্তম।"- এ হাদীসটি জাল। [তানযীহুশ শরীয়াহ, ১/২২৩।]

২৪. "কিছুক্ষণ সময় আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা এক বৎসর, অন্য বর্ণনায় ষাট সত্তর বৎসর, আর এক বর্ণনা মতে এক হাজার বৎসরের ইবাদত বন্দেগী

থেকে উত্তম।"- এটি জাল, বাতিল ও ভিত্তিহীন। [মাওযুআতঃ ৩/১৪৪, আল্লাআনী, ২/৩২৭, লিসানুল মীযানঃ ৪/১৯৪, লামহাতুমমিন তারীখিস সুন্নাহা আবু শুদ্দা, পৃঃ ৮৯, যয়ীফু জামিউসসগীর (৩৯৮৮), যয়ীফাহঃ (১৭৩)।]

২৫. "আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করলাম।"- ইমাম ইবন তায়মিয়া বলেনঃ হাদীসটি ভিত্তিহীন, অনেকে দুর্বলও বলেছেন। [দুরারঃ ২৪৫, আসরারঃ ২১১, তারীখে বাগদাদঃ ১৩/৪৯৩।]

২৬. "যে ব্যক্তি আমার উম্মত বিগড়ে যাওয়ার কালে আমার সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকাড়ে ধরবে, তার জন্য একশত শহীদের ছাওয়াব রয়েছে।- এ হাদীসটি নিতান্ত দুর্বল। [সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীস নং ৩২৬।]

২৭. "হে মুআ'য! তুমি কিসের সাহায্যে ফায়সালা করবে? তিনি উত্তর করলেন, আল্লাহর কিতাবের সাহায্যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ যদি তাতে না পাও? তিনি জবাবা দিলেন, আল্লাহর রাসূলের সুন্নাহের সাহায্যে। তিনি প্রশ্ন করলেন, তাতেও যদি না পাও? তিনি উত্তর করলেন, তাহলে (আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতের রাসূলের আলোকে) আমি ইজতিহাদ করে ফায়সালা করতে চেষ্টা করব। তার উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেনঃ আল্লাহর শোকর, তিনি যে, তাঁর রাসূলের প্রতিনিধি মুআ'যকে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার তাওফীক দান করেছেন যাতে তাঁর রাসূল খুশী হন।' হাদীসটি দুর্বল। সিলসিলা যয়ীফা, ২য় খন্ড হাদীস নং ৪৪১।]

২৮. "পাগড়ীসহ দু'রাকাত ছালাত পাগড়ী বিহীন সত্তর রাকাতের চেয়ে অনেক উত্তম।" অন্য বর্ণনায় "পাগড়ীসহ এক জুমা পাগড়ী বিহীন সত্তর জুমার সমান।- এ হাদীসগুলো জাল ও বানোয়াট।] সিলসিলা যয়ীফাঃ হাদীসঃ ১২৭,১২৮,১২৯।]

২৯. 'দারিদ্র' আমার গর্ব"।- হাদীসটি বাতিল ও জাল। আলমাছনূ ফি মা'রিফাতলি হাদীসিল মওযু-মুল্লা আলী ক্বারী, হাদীস নং ২০৭]।

◆◆◆◆

শির্‌ক সঙ্গীত

পৃথিবীতে নবী-রসূল ছাড়া এমন কোন মানুষ পাওয়া যাবে না যে, সঙ্গীত বলা হতে বিরত থাকছে বা আছে। মানুষ জ্ঞানের অজান্তে সঙ্গীত বলে থাকে। আবার কেউ জেনে বুঝে সঙ্গীত বলে আবার কেউ না বুঝে সঙ্গীত বলে। আবার কেউ মনের আনন্দ, দুঃখ, বেদনা ও উল্লাসের কারণে সঙ্গীত বলে থাকে। সঙ্গীত বলতে গিয়ে অনেক মানুষ সাদিক, ফাসিক, কাফির ও মুশরিকে পরিণত হয়। নিম্নে এমন কিছু সঙ্গীত উপস্থাপন করা হলো যার মধ্যে শিরক শব্দটি লুকায়িত আছে ঃ

(০১)

সৃষ্টিকর্তার খেলা কে বুঝতে পারে।
যে নিরঞ্জন সেই নূর নবী নামটি ধরে ॥
গঠিত কল সংসার
এক দেহে দুই দেহ হয় তার
আহাদ আহমদের বিচার
দেখ নজরে ॥
চারেতে নাম আহমদ হয়
এক হরফ তার নফি কেন কয়
সে কথাটি জানব কোথায়
নিশ্চয় করে ॥
এ মর্ম যাহারে শুধাই
ফাজিল ঝগড়া বাধায় সে ভাই
লালন বলে, স্থূল ভুলে যাই
যার তোড়ে রে ॥[১৭৯]

[১৭৯] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৩৩ ॥

www.waytojannah.com

(০২)

আহাদে আহমদ এসে নবী নামটি জানালে।
যে তনে করিলে সৃষ্টি, সে তন
কোথায় রাখিলে ॥

আহাদ নামে পরওয়ার
আহমদ নাম হল যার
জন্ম-মৃত্যু হয় যদি তার
শরার আইন কৈ চলে ॥
নবী যারে মানিতে হয়
উচিত বটে তাই চিনে লয়পুরুষ কি
প্রকৃতি কয় সৃষ্টি সৃজন-কালে ॥

আহাদ নামে কেন ভাই
মানব-লীলা করেন সাঁই
লালন বলে, তবে কেন যাই
অদেখা ভাবুক দলে ॥[১৮০]

(০৩)

আল্লার নাম সার করে যেজন বসে রয়।
তাহার কিসের কালের ভয় ॥
আল্লার নাম মুখেতে বল
সময় যে বয়ে গেল
মালেকুত মৌত এসে বলবে চল
যার বিষয় সে লয়ে যাবে
সেকি করবে ভয় ॥

---

[১৮০] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪২৯।

আল্লার নামের নাই তুলনা
সাদেক দিলে সাধলে পারে বিপদ থাকে না
সে যে খুলবে তালা, জ্বালবে আলা
দেখতে পাবে জগৎময় ॥
ভেবে ফকির লালন কয়
নামের তুলনা দিতে নয়
আল্লা হয়ে আল্লা ডাকে
জীবে কি তার মর্ম পায় ॥[১৮১]

(০৪)

আপন সুরাতে আদাম গড়লেন দয়াময় ।
নইলে কি ফেরেস্তাকে সেজদা দিতে কয় ॥
আল্লা আদম না হলে
পাপ হত সেজদা দিলে
শেরেক পাপ যারে বলে
এ দীন-দুনিয়ায়॥
দোষে সে আদম সফি
আজাজিল হল পাপী
মন তোমার লাফালাফি
তেমনি দেখা যায়॥
আদমি সে চেনে আদম
পশু কি তার পায় মরম
লালন কয়, আদ্য ধরন
আদম চিনলে হয় ॥[১৮২]

---

[১৮১] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪২৮।

www.waytojannah.com

(০৫)

আদমে আহমদ এসে নবী নাম সে জানালে।
যে তনে করিলে সৃষ্টি, সে তন কোথায় রাখিলে ॥

নবী যারে মানিতে হয়
উচিত বটে তাই চিনে লও
পুরুষ কি প্রকৃতি আকার
সৃষ্টিও সৃজন কালে॥

আরও খালেক নামে পরওয়ার
নবী রূপ সে আবার
জন্ম-মৃত্যু হয় যদি তার
শরার আইন চলে ॥
আহমদ নামে যদি ভাই
মানুষ লীলা করে সাঁই
লালন বলে, তবে যাই
এ চরণ-তলে ॥[১৮৩]

(০৬)

আকার নিরাকার সেই রব্বানা।
আহমদ আর আহাদ নামের বিচার
হলে যায় জানা ॥
খুঁজিতে বান্দার দেহে
খোদা সে রয় লুকাইয়ে
আহাদে মিম বসায়ে

[১৮২] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪২৭।
[১৮৩] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪২৬।

www.waytojannah.com

আহমদ হল সে জনা ॥
আহমদ নামে দেখি
মিম হরফ লেখে নবি
মিম গেলে আহাদ বাকি
আহমদ নাম থাকে না ॥
এই পথের অর্থ ঢুঁড়ে
কারও জ্ঞান বসবে ধড়ে
কেউ কবে লালন ভেড়ে
ফাকড়াম বই বোঝে না ॥

(০৭)

অজান খবর না জানিলে কিসের ফকিরি ।
যে নূরে নূর নবী আমার তাকে আরশ-বারি॥
বলবো কি সেই নূরের ধারা
নূরেতে নূর আছে ঘেরা
ধরতে গেলে না যায় ধরা
জ্বলছে রে বিজলি ॥
মূলাধারের মূল সেহি নূর
নূরের ভেদ অকূল সমুদ্দুর
যার হয়েছে প্রেমের অঙ্কুর
ঐ নূর ঝলক দিচ্ছে তারি ॥
সিরাজ সাঁই বলে রে লালন,
কর গে আপন দেহের বলন
নূরে নরে করে মিলন
ঐ রূপ থেকো রে নেহারি ॥[১৮৪]

[১৮৪] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪২৪।

www.waytojannah.com

(০৮)

অপারের কাণ্ডারী নবীজী আমার,
ভজন সাধন বৃথা নবী না চিনে।
ও সে আউয়াল আখের বাতিন জাহের
নবী কখন কিরূপ ধারণ করে কোনখানে ॥

আশমান জমিন জল আদি পবন
যে নবীর নূরে হয় সৃজন
বল, কিসে ছিল সে নবীর আসন
নবী পুরুষ কি প্রকৃতি আকার তখনে ॥

আল্লা নবী দুটি অবতার
গাছ বী যেরূপ দেখি যে প্রকার
তোমরা সুবুদ্ধিতে কর হে বিচার
ও তার গাছ বড় কি ফলটি বড়, লও জেনে ॥

আপ্ততত্ত্বে ফাজিল যে জনা
জানতে পায় সে নিগূঢ় কারখানা
হল রসূল রূপে প্রকাশ রব্বানা
অধীন লালন বলে, দরবেশ সিরাজ সাঁইর গুণে ॥[১৮৫]

(০৯)

কে তাহারে চিনতে পারে
এসে মদিনায় তরিক জানায়
যারে বল নবী নবী

[১৮৫] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪২৪।

www.waytojannah.com

নবী কি নিরঞ্জন ভাবি
দেল ঢুঁড়িলে জানতে পারি
আহাম্মদ নাম হল কেরে ॥
যার মর্ম সে যদি না কয়
কার সাধ্য কে জানিতে পায়
তাইতে আমার দীন দয়াময়
মানুষ রূপে ঘোরে ফেরে ॥
নফি এজবাত যে বোঝে না
মিছে রে তার পড়াশুনা
লালন কয়, ভেদ উপাসনা
না বুঝে চটকে মারে ॥[১৮৬]

(১০)

জানা উচিত বটে দুটি নূরের ভেদ বিচার।
নবীজী আর নিরূপ খোদা নূর সে কি প্রকার॥
নবীর যেন আকার ছিল
তাহাতে নূর চুয়ায় বল
নিরাকারে কি প্রকারে নূর চুয়ায় খোদায়॥
আকার বলিতে খোদা
শরাতে আকার সদা
বিনে নূর চুয়ানে প্রমাণ কি গো তার ॥
জাত এলাহি ছিল জুতে
কিরূপে এল সেফাতে
লালন বলে, নূর চিনিলে ঘোচে ঘোর আঁধার ॥[১৮৭]

---

[১৮৬] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৩৩।

www.waytojannah.com

(১১)

নবী না চিনিলে কি সে খোদার ভেদ পায় ।
চিনিতে পারিলো যে খোদায়, সেই দয়াময়॥
যে নবী পারের কাণ্ডার
জিন্দা সে চার যুগের পর
হায়তুল মুরছালিন নাম তার
সেই জান্যে কয় ॥
কোন নবী হইল ওফাত
কোন নবী বান্দার হায়াত
নেহাজ করে জানলে নেহাত
যাবে সংশয় ॥
যে নবী আজ সঙ্গে তোর
চিনে মনে তার দাওন ধরো
লালন বলে, পারের কারো
সাধ যদি হয় ॥[১৮৮]

(১২)

মদিনায় রসূল নামে কে এল ভাই ।
কায়াধারী হয়ে কেনো তার ছায়া নাই॥
কি দিব তুলনা তারে
খুঁজে পাইনে এ সংসারে
মেঘে যার ছায়া ধরে
ধূপের সময় ॥

[১৮৭] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৩৪।
[১৮৮] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৩৮।

www.waytojannah.com

ছায়াহীন যাহার কায়া
ত্রিভুবনে তার ছায়া
এ কথার মর্ম নেওয়া
অবশ্য চাই ॥
কায়ার শরীর ছায়া দেখি
যার নাই সেই লা-শরিকি
লালন বলে, তাও হয় কি
বলতে ডরাই ॥[১৮৯]

(১৩)

রসূল রসূল বলে ডাকি
রসূল নাম নিলে বড় সুখে থাকি॥
মক্কায় যেয়ে হজ্জ করিয়ে
রসূলের রূপ নাহি দেখি।
মদীনাতে যেয়ে রসূল মরেছে
তার রওজা দেখি॥
হায়াতুর মুরসাল্লিন বলে
কোরানেতে লেখা দেখি
দীনের রসূল মারা গেলে
কেমন করে দুনিয়াতে থাকি ॥
কূল গেল কলঙ্ক হল
আর কিবা আছে বাকি।
দরবেশ সিরাজ সাঁই কয়, অবোধ লালন
রসূল চিনলে আখের পাবি ॥[১৯০]

---

[১৮৯] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৪৬।

www.waytojannah.com

(১৪)

মক্করউল্লার মক্কর কে বুঝিতে পারে।
আপনি আল্লা আপনি ওলি
আপনি আদম নাম ধরে॥

পরওয়াদিগার মালেক সবার
ভবের ঘাটে পারে কাণ্ডার
তাইতো করিম রহিম নাম তার
প্রকাশ সংসারে ॥

কোরানে বলেছে খাঁটি
ওলিয়ে মোর্শেদ নামটি
আহাদ আহম্মদ সেটি
মেলে কিঞ্চিৎ নজিরে ॥

আলেফ যেমন লামে লুকায়
আদম রূপ তেমনি দেখায়
লালন বলে, জানতে হয়
মুর্শিদ জবান ধরে ॥[১৯১]

(১৫)

যেজন কামেল পীরের হয় খাঁটি ভক্ত।
পীরের বাড়ি ভক্তের কাবা মেরাজ হয় দেখা মাত্র ॥
(১) দেখবি যদি সেই কাবার ছুরাত,

[১৯০] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৪৯।
[১৯১] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৪৫।

www.waytojannah.com

পীরের হাতে হাত দিয়া পর আহালে বায়াত,
মুর্শিদ দিবে তোরে নিজের জান্নাত, হইলে তার অনুগত ॥
(২) পীরের হুকুম দায়েমি ফরজ,
বেলায়াতের ভক্ত যারা তারাই পাইলো হজ্ব,
সে ভেদ মানা কঠিন জানা সহজ, নিগুর প্রেম লীলা নিত্য ॥
(৩) পীরের চরণ ভক্তের জায়নামাজ
ও তার আত্মায় আত্মা মিশে গেলে হয় সবে মেরাজ,
ভবে মাগুক হয় আশেকের নামাজ, জেনে পড় পঞ্চাশ অক্ত ॥
(৪) জানতে যদি চাও মরার খবর,
নূর ধরিয়া পীরকে নিজের কামরতি দান কর,
নূরের জ্যোতি গায় হবে তর, সুশীল কয় আইন মতো ॥[১৯২]

(১৬)

নবীজি মরেছে বলে কোন বোকায় ।
হায়াতুন মোরছালিন নবী প্রমাণ তৈয়ব কলেমায় ॥
(১) নবী যদি মোরে যেতো, তবে কি কোরান থাকিতো-রে,
আখের ফানা সেই দিন হইতো, কেউ থাকতো না দুনিয়ায় ॥
(২) যথায় আল্লা তথায় রাসূল, আহাম্মদ হয় আহাদের মুল-রে ।
মক্কা নগরেতে মুহাম্মদি ফুল, ফুটাইলো মা আমেনায় ॥
(৩) নবী মরলে থাকতো খোদা, এই কথা যে কয় সে গাধা-রে
যার নূরে দুনিয়া পয়দা, করেছে মাবুদ মওলায় ॥
(৪) পড়ো নবীর দোরুদ ছালাম, পাঠ করো পবিত্র কালাম-রে,
সুশীল কয় যার নিলে ঐ নাম, দোজখ হারাম হইয়া যায় ॥[১৯৩]

---

[১৯২] মারেফতের বাণী, লেখক সুশীল কুমার, গান নং ৩৪, ...

www.waytojannah.com

(১৭)

কিসে গুরু ভজন হবে।
জানতে সত্য, নিগুর তত্ত্ব জনম গেল মিছে ভেবে ॥
(১) কেউ বলে পীর আল্লার ছুরাত, জানতে হয় আহালে বায়াত,
তাতেই কি মোর হবে নাজাত, যে দিন শাই হিসাব নিবে ॥
(২) ভক্তে জামিন থাকবে মুর্শিদ, কিভাবে তার হইলে মুরিদ,
কোন সময় কি করা উচিত, কি পেলে মন খুশি হবে ॥
(৩) যতই করি বিশ্বাস ভক্তি, ভজনে তার নাই উন্নতি,
সুশিল কয় মোর এই দুর্গতি, বল না কি করে যাবে ॥

(১৭)

আমি মুরিদ কই না তারে (২)
অন্তরে নাই বিশ্বাস ভক্তি, হাত ধরিয়া তওবা করে ॥
(১) বিয়ার আগে হইয়া মুরিদ, পীর মান আদবের সহিত,
করতে কিছু চাইলে খরিদ, থাক ধর্য্য ধরে।
ও তার নিজের ইচ্ছায়, যেদিন বিয়া করাইবে তোরে,
তুমি আগে পীরের হাতে দিয়া, লাইয়া যাইও বাসর ঘরে ॥
(২) মুরিদ হওয়ার আগে বিয়া, করেছ যারা না বুজিয়া,
স্বামী স্ত্রী দুই জন মিলিয়া, যাও পীরের দরবারে।
একা মুরিদ কেউ হইওনা, বউ রাখিয়া ঘরে।
ও তোর ব্যমুরিদের হাতের পানি, হারাম হবে খাইলে পরে ॥
(৩) জেনে লও মুরিদের খবর, সূরা মোমতেহেনার ভিতর,
আয়াত তার ১২ নম্বর, বলছে পারোয়ারে।
নারীকে মুরিদ দিয়াছে, দিনের পয়গাম্বরে
সুশীল কয় না মানলে কাফের, হবি আইন অনুসারে ॥[১৯৪]

---

[১৯৩] মারেফতের বাণী, লেখক সুশীল কুমার, গান নং ৬৬, ...
মারেফতের বাণী, মুনি মালা, লেখক সুশীল কুমার, গান নং ৩৪

www.waytojannah.com

(১৮)

গুরুর ভাব বুঝে লও আগে (২)
বিবেক বুদ্ধি আদব কায়দা, বিশ্বাস ভক্তি প্রেম সোহাগে ॥

(১) ধরলে মুর্শিদ চিনবি খোদা, নয়নে রূপ দেখবি সদা,
তাজিমে কর সেজদা, যারে ভাল লাগে।
বেইচ না কেউ বেচা মাথা মরণেরি আগে,
দুদেল বান্ধা কলেমা চোর, বিচার হবে গুরু ত্যাগে ॥

(২) থাকতে মুর্শিদ ভক্তের বাড়ি, মিলন হইলে স্বামী স্ত্রী,
সুখাইবে দেহ তারি, ধরবে নানা রোগে ॥
কেউ কখনো ঘুমাইও না পীর যদি রয় জেগে,

(৩) চোখ ইশারায় বুঝে নিও, কি ধন পীরের অতি প্রিয়,
চাওয়ার আগে সুফে দিও, যখন যাহা লাগে।
সুশীল কয় পার হইতে যদি মনে আশা জাগে,
ও তোর জানের চেয়ে প্রিয় যাহা, সুফে দাও রশিদের ভোগে ॥

(১৯)

নবী মেয়ারাজ হতে এলেন ঘুরে।
বলে না ভেদ কারো তারে ॥
শুনে আলী কহিছে তখন
দেখে এলে আল্লা কেমন
নবী কয় ঠিক তোমার মত
কর আমল আমি বল যারে ॥

এসে আবু বকর সিদ্দিক বলে
আল্লা কেমন দেখে এলে
রূপটি কেমন দেবেন বলে
নবী বলে তুমি দেখ তোমারে ॥

তারপর কহিছে ওমর
কেমন আল্লার আকার প্রকার
নবী কয় ঠিক তোমার আকার
আইনাল হকতাই কোরান ফুকারে॥

পরে জিজ্ঞাসিল উসমান গনি
আল্লা কেমন বলুন শুনি
নবী কয় যেমন তুমি
তেমন ঠিক পরোয়ারে ॥

নবী মেয়ারাজে গিয়ে
যে ভেদ তিনি এলেন নিয়ে
নবিজী যা বুঝাইল
চার জনে চার গোলে প'ল
লালন প'ল বিষম গোলে ॥[১৯৫]

[১৯৫] [১৯৫] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৩৯।

(২০)

আর কি গৌর আসবে ফিরে ।
মানুষ ভজে যে যা কর,
গৌর চাঁদ গিয়েছে সেরে ॥

একবার এসে এই নদীয়ায়
মানুষ রূপে হয়ে উদয়
প্রেমে বিলালে যথা তথায়,
গেলেন প্রভু নিজ পুরে ॥

চার যুগের ভজন আদি
বেদেতে রাখিয়ে বিধি
বেদের নিগূঢ় রসপন্থী
সঁপে গেলেন শ্রীরূপে রে॥

আর কি সেই অদ্বৈত গোসাঁই
আনবে গৌর এ নদীয়ায়
লালন বলে, সে দয়াময়
কে জানিবে এ সংসারে ॥[১৯৬]

(২১)

[১৯৬] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৫৮।

www.waytojannah.com

আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা ।
মুড়িয়ে মাথা, গলে কাঁথা, কটিতে কৌপীন ধড়া॥
গোরা হাসে কাঁদে, ভাবের অন্ত নাই
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই
জিজ্ঞাসিলে কয় না কথা, হয়েছে কি ধন- হারা॥
গোরা শাল ছেড়ে কৌপীন পড়েছে
আপনি মেতে জগত মাতিয়েছে
মরি হায় কি লীলে কলিকালে বেদবিদি চমৎকারা ॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি হয়
গোরা তার মাঝে এক দিব্য যুগ দেখায়
অধীন লালন বলে, ভাবক হলে সে জানে তারা ॥[১৯৭]

(২২)

সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে ।
লালন ভাবে জাতের কি রূপ
দেখলেম না এই নজরে ॥

কেউ মালায় কেউ তসবি গলায়,
তাইতো যে জাত ভিন্ন বলায় ।
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়,
জাতের চিহ্ন রয় কার রে ॥

[১৯৭] [১৯৭] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৪৫৯।

www.waytojannah.com

যদি ছুন্নত দিলে হয় মুসলমান,
নারীর তবে কি হয় বিধান।
বামন চিনি পৈতা প্রমাণ,
বামনি চিনি কিসে রে ॥

জগৎ বেড়ে জেতের কথা,
লোকের গৌরব করে যথা তথা।
লালন সে জেতের ফাতা
ঘুচিয়াছে সাধ বাজারে ॥

(২৩)

সবে বলে লালন ফকির হিন্দু কি যবন।
লালন বলে আমি আমার না জানি সন্ধান ॥
একই ঘাটে আসা যাওয়া
একই পাটনী দিচ্ছে খেওয়া
কেউ কায় না কারও ছোঁয়া
বিভিন্ন জল কে কোথায় পান ॥
বেদ-পুরাণে করেছে জারি
যবনের সাঁই, হিন্দুর হরি
লালন বলে বুঝতে নারি
দুই রূপ সৃষ্টি করলেন কি তার প্রমাণ ॥
বিবিদের নাই মুসলমানী
পৈতা যার নাই সেও তো বামনী
বোঝ রে ভাই দিব্যজ্ঞানী
লালন তেমনি খাতনার জাত একখানা ॥[১৯৮]

[১৯৮] লালন গীতি সমগ্র, লেখক ওয়াকিল আহমেদ, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ১৪ এপ্রিল, ২০০২, প্রষ্ঠা ৫৩২॥

www.waytojannah.com

(২৪)

জিজ্ঞাসিলে খোদার কথা,
দেখায় আসমানে।
আছেন কোথা স্বর্গপুরে
কেউ নাহি তার সন্ধান জানে ॥

পৃথিবী গোলাকার শুনি
দিবানিশি ঘোরে আপনি
তাই তো হয় দিন-রজনী
জ্ঞানী-গুণী তাহাই মানে ॥

এক দিকের দিবা হলে
অন্য দিকে নিশি বলে
আকাশ তো দেখে সকলে
উর্ধ্ব-অধরে মানুষ গণে॥

আপন ঘরে কে কোথা রয়
না জেনে আসমানে তাকায়
লালন বলে কেবা কোথায়
তাই ভাব মনে মনে ॥

বই প্রাপ্তির স্থান

- হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী
  ৩৮, নর্থ সাউথ রোড, বংশাল, ঢাকা।
  মোবাঃ ০১৯১৫-৭০৬৩২৩

- মাসিক আত-তাহরিক
  নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

- তাওহীদ পাবলিকেশন্স
  ৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল
  ২২১, বংশাল রোড, ঢাকা- ১১০০
  মোবাঃ ০১৭১১-৬৪৬৩৯৬

- ইসলামিয়া লাইব্রেরী
  সাহেব বাজার, রাজশাহী।

- আলিয়া লাইব্রেরী, সাহেব বাজার
  রাজশাহী।

- কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, আলীগড়
  রাজশাহী।

- করিম বুক ডিপু, কোর্ট স্টেশন
  রাজশাহী।

www.waytojannah.com

যাঁদের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ

- মাওলানা আব্দুল্লাহ সালাফী
  খতীব, নওহাটা আহলে হাদিছ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, রাজশাহী
- মোঃ আব্দুল হাকিম
  প্রভাষক, দারুসা কলেজ, রাজশাহী
- আব্দুল আজিজ
  সভাপতি, তাওহীদ পাঠাগার, পবা, রাজশাহী
- মাহফুজুর রহমান
  রাস্ট্র বিজ্ঞান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
- আলহাজ্জ মোঃ কাজেম আলী
  পশু চিকিৎসক, রাজশাহী
- মাওলানা আবু বকর সিদ্দিক
  খতীব, পলাশবাড়ি আহলে হাদিছ জামে মসজিদ
- মাওলানা শামসুল হুদা বিন আবদুল্লাহ
  খতীব, বাগধনী আহলে হাদিছ জামে মসজিদ
- মোঃ সালাহ উদ্দিন
  এ.আই.ই.টি, রাজশাহী
- মোঃ ইসরাফিল
  পলিটেকনিক, রাজশাহী
- আব্দুল আজিজ
- মোঃ শাব্বির আহমাদ

www.waytojannah.com